BANGLA KOUNTERKULTURE ARCHIVE MAGAZINE

ODDJOINT



010/DECEMBER 2017

মুসাবিদা

সাক্ষাৎকার

বিষয়ঃ পার্থপ্রতিম

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল - গদ্য ও কবিতা

কভার ফটো : কিউ

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক্

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Subhamay | Arka

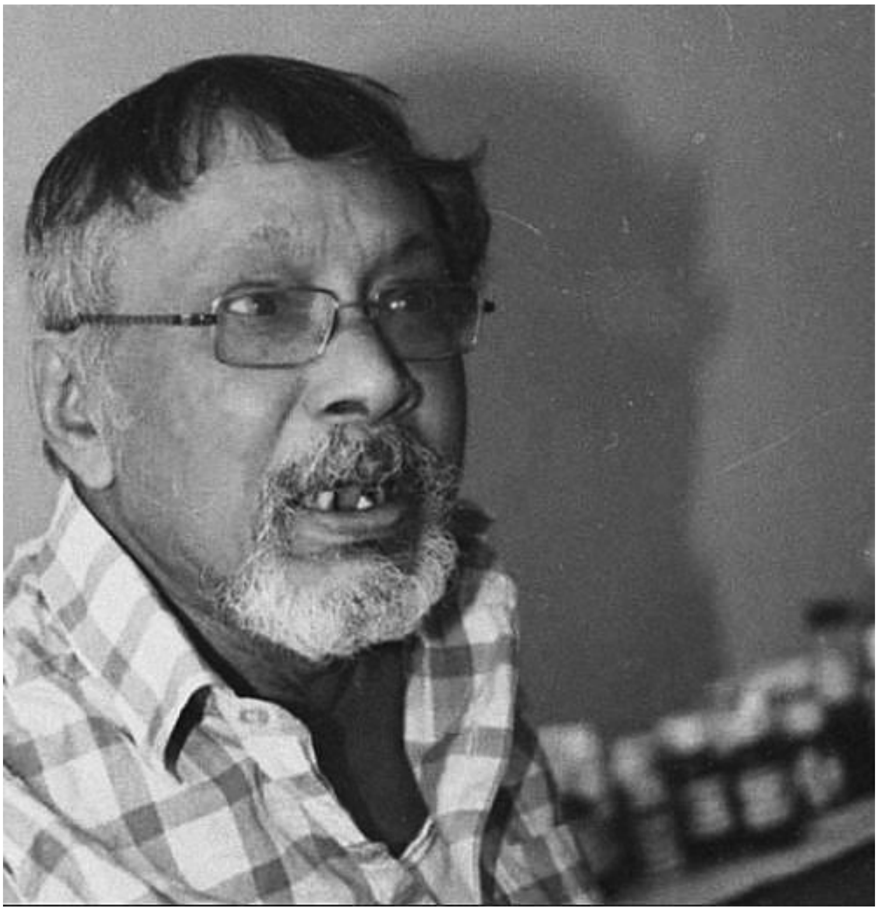
পৌষ ১৪২৭ ● ডিসেম্বর ২০২০



প্রতিকৃতিঃ সম্বরণ দাস

পা র্থ প্র তি ম কা ঞ্জি লা ল

২৩ । ১২ । ১৯৪৯ - ২৯ । ০৯ । ২০২০



কাজরা মহব্বতওয়ালা

সুরজিৎ সেন

পার্থপ্রতিমের সঙ্গে আলাপ হয় ১৯৮৩ সালে, আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আরেক কবি বন্ধু সোমক দাস, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে এক সন্ধ্যায় । সেই আলাপ গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল । আলাপ হওয়ার কয়েকদিন পরেই বলেছিলেন, 'দেখুন আমার নাম পার্থপ্রতিম, কিন্তু লোকে আমাকে পার্থ বলে ডাকে । আমি তো পার্থ নই, আমি তো কর্ণ । যে জারজ, সেদিক থেকে আমি কি জারজপ্রতিম নই? আমাকে এই নামেই ডাকা উচিত নয় কি? বা সংক্ষেপে জারজ । আপনার কী মনে হয়?' এইসব কূটপ্রশ্নের সামনে আমাকে পড়তে হত প্রায়শই, শুধু আমি নই, পার্থপ্রতিমঘনিষ্ঠ অনেককেই ।

১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আমার জীবনে নেশানাচগানসিনেমাসাহিত্য নিয়ে এক জমজমাট পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালপর্ব চলেছিল । তাঁর ঘোষ লেনের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছি, তিনিও আমার চন্দননগরের বাড়িতে বার তিনেক এসেছিলেন, একবার থেকেও ছিলেন । সেইসব দিনগুলি রাতগুলির ফুর্তিফার্তাকে আজ আমাদের বন্ধুবর্গের সমষ্টিগত আরব্য রজনী বলেই মনে হয় । সাহিত্য ছাড়াও আমাদের দুজনের একটা বিষয়ে গভীর মিল ছিল, আমরা দুজনেই হিন্দি ফিল্মি গানের ভক্ত, শুধু গান নয়, সিনেমারও ভক্ত ছিলাম । গুরু দত্তর সিআইডি, পিয়াসা আর সাহেব বিবি গুলাম আমরা একসঙ্গে দেখেছিলাম, প্রথম দুটি অধুনা লুপ্ত 'প্রভাত'[চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ] সিনেমা হলে, শেষেরটি আজ আর মনে নেই কোন হলে দেখেছিলাম, হয়তো 'জহর' এ । নুরজাহান, শামশাদ বেগম, গীতা দত্ত, আশা ভোঁসলে- এঁদের গানের ভক্ত ছিলেন পার্থপ্রতিম, বলা বাহুল্য, আমিও । মনমোহন দেশাই পরিচালিত 'কিসমত' ফিল্মে শামশাদ বেগম ও আশা ভোঁসলের গাওয়া ওঁর প্রিয় 'কাজরা মুহব্বতওয়ালা' দ্বৈতসঙ্গীতটিকে উনি হিন্দু – মুসলমানের একটি ছোটখাটো দাঙ্গা হিসেবেই অভিহিত করতেন ।

আমার ধারণা, আমার এই ধারণা নির্ভুল যে, পার্থপ্রতিম ছিলেন এক শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব, তাঁর পূর্বসূরী আরও অনেক কবির মতই । বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, তবু বলি এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর । সর্বক্ষণ এক তুরীয় অবস্থায় থাকতে চাইতেন । অথচ জীবন তাঁকে বারবার আছড়ে ফেলত বাস্তবের মাটিতে, তখনই তিনি ক্ষিপ্ত হতেন নিজের উপর, পারিপার্শ্বিকতার উপর । পার্থপ্রতিম নিজের ভাবে মশগুল হয়ে থাকতেন আর বন্ধুবলয়ে ছড়িয়ে দিতেন সেই নেশা, আবিষ্ট হয়ে থাকতাম আমরা । ব্যাপারটা কী রকম?

১. রাত প্রায় দশটা, পাথর এখনো তেতে আছে / মড়া পুড়ছে যমুনার ধারে / শানের ওপরে বসে পুরুষযৌবন, গাঁজা হাতে, পাশেই মিঠাই / পাশে খোদা, মুহব্বত, বদলা নেওয়া, ঘানি /... [নৈশ / টেবিল, দূরের সন্ধ্যা]

২.মাঝে মাঝে আমাকে বেপাড়ায় দেখা যায় । বলা দরকার যে, পুরুষদের বেশ্যাগমনে যেহেতু সমাজের মৌন সমর্থন আছে, সেই কারণে, এই অঞ্চলকে আমার নিষিদ্ধ মনে হয়নি; এছাড়াও, অভাবীদের সঙ্গে যৌনতা হয় না – খ্যাতিহীন কবিদের স্ত্রীরা প্রায়ই যা বুঝে ওঠেন । তা-ও, আমাকে এই যৌনপল্লীতে বা সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায় । ... [বিরহ / টেবিল, দূরের সন্ধ্যা]

৩. ...আজ্ঞা, আজ্ঞা । ঈশ্বর, তোমাকে জানি মলমূত্রবৎ । / বিপরীতপ্রসূতিসদনে, বাচ্চার চিতার কাছে / রূপোর খাঁড়ারা ওঠে, গর্ভগর্ত, নড়ে জিহ্মজিভ, / উরুব্যাদানের পল্লী, কঁহি ধুঁয়া য়ঁহা নাচেনাচে / আউয়া আউয়া । জুয়া খেলে যোনিগুহাসর্পশিব, / প্রচেত হাউই বলেঃ আমার বাপের সঙ্গে শো, মা । / সঙ্গমনর্তিত নিতম্বের চন্দ্রহারের সুষমা / ব্রহ্মবাহিনীর জলে, চক্রে প্রণবচতুর । দোষী / হিম, শব নেই । অগ্নি, কবি আছে । রাত্রি চতুর্দশী । [রাত্রি চতুর্দশী / রাত্রি চতুর্দশী]

আশা করি ব্যাপারটা খানিকটা বোঝানো গেছে এই তিনটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে । আর আত্মরক্ষার রণকৌশলে পার্থপ্রতিম নিজের চারপাশে গড়ে তুলেছিলেন সমাপতন আর অলৌকিক যোগসাজসের এক রহস্যময় জগত, যা তাঁর সমসময়ের প্রগতিশীলদের বিচারে বেশ প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ । কিন্তু এইভাবে প্ররোচিত করতেন তিনি, এসবে আনন্দ পেতেন ।

১৯৮৮ সালের পর কাজের সূত্রে আমি অন্য এক পৃথিবীতে ঢুকে যাই । পার্থপ্রতিমের সঙ্গে যোগাযোগ কমে যায়, মাঝে মাঝে দেখা হোত কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গেলে । এর ১০ বছর পর, ১৯৯৮ সালে আমি আর বন্ধু অর্পিতা ঘোষ যখন 'রাত্রি চতুর্দশী ও টেবিল, দূরের সন্ধ্যা' এই দুটি কাব্যগ্রন্থকে এক মলাটের মধ্যে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিই পার্থপ্রতিমকে তখন প্রথমে নারাজ

হয়েছিলেন । পরে আমাদের সঙ্গে নাতিদীর্ঘ আলোচনা শেষে রাজি হন এবং বইটির মুখবন্ধে 'প্রাগজ্যোতিষ' শিরোনামে লিখেছিলেন কেন 'রাত্রি চতুর্দশী'কে তিনি আর সনেট সংকলন বলতে রাজি নন । বাংলা ভাষায় খুব কম কবিই আছেন, যিনি নিজের কবিতার এমন পুনর্মূল্যায়ন করেছেন প্রকাশ হবার ১৬ বছর পর ।

পার্থপ্রতিমের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল নন্দীগ্রামে গণহত্যার প্রতিবাদ মিছিলে [তিনি যে মিছিলের অন্যতম সংগঠকও ছিলেন] ওই কলেজ স্ট্রিট পাড়াতেই ।

গত সেপ্টেম্বর ২৯ তারিখে সকাল ১০টায় বন্ধু অর্ক দেবের ফোনে জানতে পারি পার্থপ্রতিম প্রয়াত হয়েছেন । আন্তর্জালে এই বাংলাব্ল্যাক পত্রিকাটি আমরা শুরু করেছিলাম ২০১৫ সালের এপ্রিলে মাসিক পত্রিকা হিসেবে । মাসে একটি করে সংখ্যা প্রকাশ হবে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল আর ওই বছরেই নভেম্বর মাসে এর শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় । এরপর ২০১৭ সালের জুলাই মাসে হঠাৎই একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় । এবছরই আমরা ভাবছিলাম, যে, পত্রিকাটি আবার নিয়মিত প্রকাশ করা যায় কি না । এমন সময় মনে পড়ে, বাংলাব্ল্যাকের জুলাই ২০১৫ সংখ্যায় আমরা পার্থপ্রতিমের 'রাত্রি চতুর্দশী' বইটির আন্তর্জাল সংস্করণ প্রকাশ করেছিলাম এবং অগস্ট ২০১৫ সংখ্যায় ওঁর 'টেবিল, দূরের সন্ধ্যা' বইটির আন্তর্জাল সংস্করণ প্রকাশ করেছিলাম । এবার যখন পত্রিকাটির পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবা হচ্ছে, তখন প্রথমেই মনে হয়, আগামী ২৩ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালকে ফিরে দেখার মধ্যে দিয়েই এই পুনরুজ্জীবন হতে পারে, তাঁর কবিতার পুনর্পাঠের মধ্যে দিয়ে উদযাপন হতে পারে আমাদের প্রিয় কবির জন্মদিন ।

পার্থপ্রতিম ছিলেন সুরনৃত্যমগ্ন এক কবি যিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের শেষ প্রচ্ছদে শাক্তপদাবলী থেকে উদ্ধৃত করেন:

নাচবার ইচ্ছে থাকে যদি   বলি তোমায় নাচবার বিধি

পাতা আছে এই আঁধার-হৃদি, তাতেই নাচতে হবে ।

তোমার পা শক্ত কি মোর হৃদয় শক্ত,

তবেই জানা যাবে শিবে॥

‘কোনও লেখক বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হয় না’ - পার্থপ্রতিম

রনজিৎ দাশ

এই সাক্ষাৎকার মৌখিক নয় । রণজিৎ দাশের একটি লিখিত প্রশ্নমালার উত্তর লিখে পাঠিয়েছিলেন পার্থপ্রতিম ।



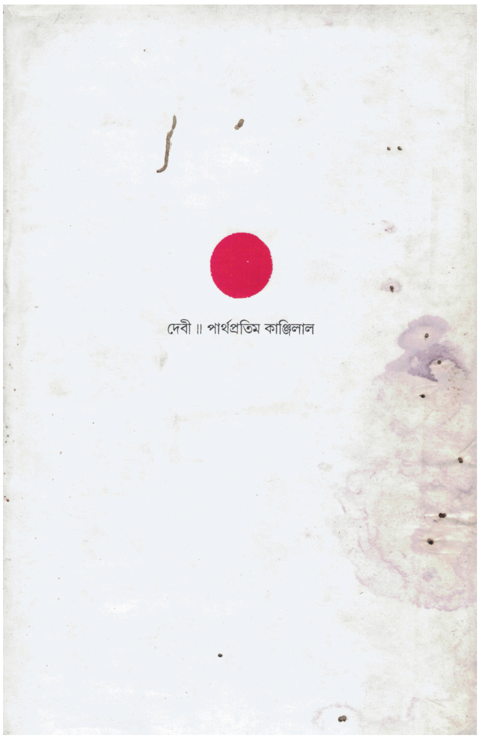
প্রতিকৃতিঃ কৌশিক সরকার

প্রঃ আপনার জন্ম ১৯৪৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, কলকাতায় । আপনি থাকেন ১৩সি, ঘোষ লেন, কলকাতা -৬ ঠিকানায়, বহু দিন ধরেই ওখানে আছেন । পড়াশুনা করেছেন স্কটিশচার্চ স্কুলে এবং অনেক কলেজে, কলাবিভাগে স্নাতক হয়েছেন ১৯৭১ সালে । নিজের পছন্দ এবং প্যাশন অনুযায়ী বিয়ে করেছেন শ্রীমতী অঞ্জনা দত্তকে, ১৯৭৬ সালে, আপনাদের একটি কন্যাসন্তান বর্তমান, যার নাম রেখেছেন মণিকর্ণিকা । প্রায় ১৯৮০ থেকে আপনি একটি রাজ্য সরকারি সংস্থায় কর্মরত । সাহিতা এবং বন্ধুবান্ধবই আপনার বেঁচে থাকার মুখ্য অবলম্বন । আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এই প্রাথমিক তথাগুলি ঠিক বললাম তো?

উঃ হ্যাঁ । যদিও, লেখা ও লেখাসতীর্থরা (আমার অন্য বন্ধু নেই) আমার বেঁচে থাকার মুখ্য অবলম্বন নয় । যে কোনও মানুষ বা প্রাণীর মতো, আমারও বেঁচে থাকার মুখ্য অবলম্বন কোনো অজ্ঞাত কারণ বা কারণগুচ্ছ । আমি, তারই এক তুচ্ছপুচ্ছ...

প্রঃ কী ক'রে সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো? কোনও বিশেষ আবহ, বা কারণ? কবে থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন? এই ঘনিয়ে ওঠা, এই আরম্ভ - এ বিষয়ে কোনও বিশেষ স্মৃতি বা রহস্য বা বিশ্লেষণ যদি কিছু থাকে তো বলুন ।

উঃ মা চাইতেন, আমি লেখক হিসাবে অর্থ-যশ পাই । খেলাবিহীন - পড়াশোনায় ঝোঁক যায় - আনুকূল্যও ছিল - বাবা মর্ডান ইন্ডিয়া প্রেসে যুক্ত ছিলেন । লেখালেখি যে কারণে সবাই আরম্ভ করেন – মৃত্যুর বিরুদ্ধে



প্রতিবাদের জন্যে । কবিতার খসড়া শুরু করি '৬৩ র এক বর্ষায়, অঙ্কের প্রশ্নপত্রের সাদা পশ্চাদ্দেশে । স্মৃতি, রহস্য, বিশ্লেষণ - এসব অভিব্যক্তিগত সুতরাং ত্যাজ্য ।

প্রঃ আপনার কবিতা প্রথম ছাপা হয় কবে, কোন কাগজে? আপনার রচিত প্রথম কবিতাটি, অন্তত তার ভগ্নাংশ, মনে পড়ে? দয়া করে বলবেন?

উঃ অমিতাভ বসু সম্পাদিত 'ইমন' কবিতাপত্রে - ১৯৬৫, ১৫মার্চ, দোল । লেখাটি হতকুৎসিৎ .. . তার প্রসঙ্গে আমার দয়ার ভগ্নাংশও নেই । সেটি প্রথম লেখা নয় - প্রথম লেখার কিছুই মনে নেই ।

প্রঃ শৈশব এবং কৈশোর প্রতিটি মানুষের জীবনেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, লেখকের জীবনে আরও বেশি । আপনার বাল্যকাল কী ভাবে কেটেছে এবং লেখালিখির ওপর তার ছাপ বা প্রভাব কতখানি, এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন ।

উঃ : প্রিয়, প্রুস্ত পড়বার দিন নয় অদ্য - মুদ্রণে মুখোমুখি আমরা । এক কথায় বলি, উলটো শৈশব ও উলটো কৈশোর । হ্যাঁ, লেখালেখিতে - অন্তত এটা বলা যাবেই যে, যে শ্বেতাংশুকোমল সুধালাবণ্য আমি ধরুন রবীন্দ্রনাথ থেকে গৌতম বসু পর্যন্ত পড়ে এলাম -নিজে তো তা ১ পংক্তিতেও করতে পারিনি । পাঠকের পরিপাকশক্তির উন্নয়নে আমার কোনও স্থান নেই । দায়ী ওই উলটো শৈশব-কৈশোর । এরপর বোদলেরের পড়ে কবিতার পুষ্পল প্রদেশ সম্পর্কে ভুল ধারণা হয়েছিল । প্রযুক্তিবিজ্ঞানের তীব্রতম আগুনের পরীক্ষায়, ফুলের পরাগের অমরতা আজ প্রমাণিত ।

প্রঃ আপনার লেখা থেকে, এবং আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুত্রে যতদূর জানি আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন । অকাল্ট-এ বিশ্বাস করেন । কী ভাবে আপনার ঈশ্বর বিশ্বাস এলো, এবং কী ভাবেইবা আপনি জীবনের নানা দ্বন্দ্ব এবং প্রশ্নের মধ্যে এই বিশ্বাসটাকে টেনে নিয়ে চলেছেন? অকাল্ট বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী? একজন বিশ্বাসী এবং একজন অবিশ্বাসী লেখক,এই দু'জনকে আপনি কীভাবে তফাৎ করেন?

উঃ কোনও লেখক বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হয় না, সে বিশ্বাসার্থী । বিশ্বাসী অবিশ্বাসী - এসব হয় মুহূর্তগত বর্ণনা নয় বাংলা যাত্রার ভাবালু শব্দ । তাহলে, আমি ঈশ্বরবিশ্বাসার্থী - আমার কথা মতো । প্রথমে আমি ছিলাম না-নাস্তিক না-আস্তিক, পরে ঈশ্বরের এই প্রমাণনিরপেক্ষতার দিকটা খুব পছন্দ হয় । তবু ঈশ্বরের এক মজার প্রমাণ আছে, সেটা হল গান । এরপর দেখি যে সাহিত্যও প্রমাণ করা যায় না । এমন আরও অনেক- কিন্তু; আসল কথা হল আমি জুয়াড়ি । গত '৮৩ সালে এক একদিনের ক্রিকেট ছিল । খেলা আমি বুঝি না, তত রসও পাই না - সময় কাটাবার জন্য সে খেলা দেখতে যাই গৌরাঙ্গ ভৌমিকের বাড়িতে । ভারত যখন শেষ করল, বুঝলাম যে মুহূর্তে কেউই ভাবছে না সে জিতবে । তৎক্ষণাৎ আমি আমার জুয়া ধরলাম ঈশ্বর থাকলে এ-ই জিতবে । এই জুয়ার কারণ, আমি জুয়ার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্পর্কে এক অকাট হ্যাঁ কী না-কে পেতে চেয়েছিলাম । কী হয়, আপনি জানেন - এক চিঠিতে এ ব্যাপার আমি জানিয়েও ছিলাম আপনাকে । তবু সখেদে বলি, ঈশ্বর আমাকে তত বিশ্বাস করে না - দেখি । অথচ, মাঝেমাঝেই বড়ো বিরক্ত করে



প্রতিকৃতিঃ কৌশিক সরকার

। উক্ত বিশ্বাসটি আমাকে টানতে হয় না - ওটিই আমাকে টানে । অকাল্ট বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মানুষের মায়ায় যথেষ্ট মুগ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি তিনি ধরতে পারবেন না । এর বেশি বলার দরকার নেই ।

প্রঃ আপনার প্রথম কবিতার বই ‘দেবী’, প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে । বইটিতে আপনার তৎকালীন প্রকাশিত কবিতাগুলি কিছুই সংকলিত হয়নি, বরং একটি বিশেষ থিমকে কেন্দ্র করে রচিত হয় গ্রন্থটি, আপাতভবে এক দীর্ঘ আবাহন এবং বন্দনা গান । ব্যক্তিগতভাবে এই বইটির উদ্দেশ্যে বা তাৎপর্য বুঝতে পারিনি, কবিতা হিসেবেও একে খুব উচ্চাঙ্গের মনে হয়নি । আপনি কোন মানসিক অবস্থার মধ্যে অন্য কবিতাগুলিকে বর্জন করে এই বইটি করেছিলেন? এখন আপনি বইটি বিষয়ে কী মত পোষণ করেন?

উঃ ‘দেবী’ সম্পর্কে আপনার ধারণা যে নিম্নাঙ্গের তা এই কথোপকথনের পাঠককে আপনি জানাতে ভুলছেন না - একইসঙ্গে, এর জেনেসিস বিষয়ে প্রশ্ন রাখছেন । গল্প এই যে ‘৭০-এর নভেম্বরে দেবীর শেষ লেখাটা মুসাবিদা করার পর টের পাই - গ্র্যাজুয়েট হওয়া অথবা বইটির কর্মসাফল্য - একটা বেছে নিতে হবে । এটাই হবার কথা, কারণ যে জায়গায় আমি কলম চালাতে চেয়েছি সেই বিশেষ নিখিলভঙ্গিমাটি নিজেকে গোপন রাখতেই পছন্দ করেন । খুব ভয় পেয়ে যাই- গ্র্যাজুয়েট হওয়ার ইচ্ছা হয়, বইটি ফ্লপ করে - অন্তত বাংলাদেশের সাড়ে তিনশো কবির কাছে । তেলিপাড়া লেনে এই বইটির এক ভক্ত থাকতেন, যুবা, সাহসী ও শ্রমিক । বছর দুই আগে, যখন তার বিয়ে ঠিকঠাক - কোনও পূর্বাভাষ না দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন ও শবশয্যায় দেবীর কপি পাওয়া যায় । বইটির প্রথম লাইন ভুল, তমিশ্বরী, প্রসীদ হবে । যদি ৪০ বছরে পা দিতে গারি তাহলে এর কিছু পরিমার্জনা করব । একটাই সমস্যা যে, মদ খেয়ে বসব সে কাজে আফিম না খেয়ে ।

প্রঃ যতদূর মনে পড়ে, আপনি এবং অমিতাভ গুপ্ত যুগ্মভাবে 'কৃত্তিবাস পুরস্কার'এর জন্য মনোনীত হয়েছিলেন কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের অনেকের কাছেই অস্পষ্ট থেকে গেছে । প্রকৃত ঘটনাটা যদি বলেন ।

উঃ : ১৯৭০, মার্চে একদিন তুষার রায় বললেন, পার্থ আপনি আর অমিতাভ কৃত্তিবাস পুরস্কার পেয়েছেন । আমার সঙ্গে নিশীথ ছিলেন । এখন, তুষার মাজুম খাইয়ে মানুষ; আমি প্রথমে ধরিনি - তা বুঝতে পেরে উনি আরও বলতে থাকলেন । মাথায় খুন চেপে গেল । (নিশ্চয় জানেন, এই প্রাইজ আগে পেয়েছিলেন শামশের, শান্তনু ঘোষ ও দেবারতি - ১৯৬৯পর্যন্ত । এই সময় পর্যন্ত এই তিনজন কোনো কবিতা - লিখে উঠতে পারেননি - আমার ধারণা

। না হলে, আমি ওদের সঙ্গে পুরস্কার নেওয়া নিয়ে কথা বলতাম - কারণ, শিল্প পুরস্কার দেওয়া একটা বিরাটতম পাপ ও নেওয়া এটা অনুরূপ অন্যায় । তখন স-নিশীথ কাছাকাছি ভারবিতে[প্রকাশনী] শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সকাশে যাই । তিনি সহাস্য বলেন, “পার্থ, এবার মেরে দিয়েছ!” এই কথার আগে পর্যন্ত শক্তি সম্পর্কে আমার ধারণা, মানুষ হিসেবেই অনেক উঁচু ছিল । যা হোক, ঘৃণায় দিশেহারা হয়ে বলি, “খুব খারাপ করছেন । ” শক্তি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন এবং শশব্যস্ত বলেন, “আমি না- আমি না । ” পরে দৈনিক কবিতায় এই খবরটা দেখি । আমার ঘৃণা আরও বেশি ছিল এই কারণে যে অমিতাভ গুপ্ত ও আমি - দুজনেই তখন খুব দরিদ্র । অমিতাভ গুপ্তের সঙ্গে কথা তখনও হয়নি - হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অত্যধিক ঘৃণা ও রাগে আমার আর ঠিক ছিল না । তখন আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি যে ওই

দেখছি, ফেম একবারই এসেছিল নীরবে । এও দেখেছি যে ফ্রেমে বাঁধানো নই । আরও অনেক কঠিন বিরদ্ধতা হতে পারত - কারণ, আমার লেখালেখি, ইংরেজায়নের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য - বাঃ, আমি তো দেখেছি ঋতুরাজ বসন্ত । অগ্রজ শীতকাতর শিশির (বোতলের), আর অণুজ নিদাঘ, চড়ক । বিতর্কিত ইমেজ? সেও তো বেশ বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা ।

সংস্থা পরে আর এ জিনিস করেননি । শিল্প পুরস্কার ফেরৎ দেওয়াটা স্টান্ট কেউ কেউ বলছেন আজকাল - আর কোনও কথা না বলেই । তা হতে পারেই, কিন্ত এ জিনিস নেওয়াটা ব্লান্ট, পাপ ।

প্রঃ আবির্ভাবের পর থেকেই আপনি খ্যাতি এবং সমাদর পেতে শুরু করেন । সম্পূর্ণই আপন লেখার স্বাতন্ত্র এবং উৎকর্ষের জন্যে, বলাইবাহুল্য । ক্রমে এই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কমে আসে । একটা সময়ে, আপনার প্রতিষ্ঠানবিরোধী রূপটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এক দুর্দম ডমিনেটিং একাকীত্ব আপনাকে চিহ্নিত করে । অনেকটা যেন 'আঁ ফা তেরিবল' হয়ে ওঠেন আপনি । বন্ধু অগ্রজ এবং অনুজ লেখক আপনাকে অপছন্দ করতে শুরু করেন, আপনার কাব্য বিষয়েও একটা কঠিন বিরুদ্ধমত তৈরি হয়ে যায় । আপনার ঔদ্ধত্য, দুর্ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা এবং কূটনীতির নানা অভিযোগ চতুর্দিকে শোনা যায় । ক্রমে এগুলিও ঝিমিয়ে আসে । কিন্তু এরই মধ্যে আপনার একটি বিতর্কিত ইমেজ তৈরি হয়ে যায়, সেটিই এখনও চলছে । আপনার এই আর্লি ফেম, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা (এবং ইদানিং প্রতিষ্ঠানের কাগজে লেখালেখি), চরিত্র বিতর্ক - এসব প্রসঙ্গে আপনার নিজের কিছু কথা শুনতে চাই ।

উঃ দেখছি, ফেম একবারই এসেছিল নীরবে । এও দেখেছি যে ফ্রেমে বাঁধানো নই । আরও অনেক কঠিন বিরদ্ধতা হতে পারত - কারণ, আমার লেখালেখি, ইংরেজায়নের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য - বাঃ, আমি তো দেখেছি ঋতুরাজ বসন্ত । অগ্রজ শীতকাতর শিশির (বোতলের), আর অণুজ নিদাঘ, চড়ক । বিতর্কিত ইমেজ? সেও তো বেশ বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা । এক - নোবেল পাওয়া পদার্থবিজ্ঞানী নিলস বোর বলেছেন The truth attains quality only when it becomes controversial হে হে । য়্যাদ্দুর কিছু হয়েছে কি না আমার জানা নেই । দুটো জিনিস জানি । আমি প্রতিষ্ঠানবিরোধী নই, প্রতিষ্ঠানভীরু ছিলাম । এখন তাও নই, কারণ চারশো বিশ মাস বয়েস হতে চলল । আর ঔদ্ধত্য, দুর্ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা ও কুটনীতির নানা অভি+যোগ (অভি+নিবেশ যেমন) আমার মধ্যে আমি সব সময়েই দেখে আসছি । মনে হয় যে অন্যান্য লেখকদের মধ্যে এই চারটে জিনিসের অভাবই আমার মধ্যে এ জিনিস তৈরি করেছে, কারণ প্রকৃতি

শূন্যতা সহ্য করে না । যারা এ বিষয়ে আপনাকে বিজ্ঞাত করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে গাইছি "কর দো জী ঘায়েল । তুমহারা হ্যায় জমানো - কঁহি পে নিগহে কহি পে নিশানা - "

প্রঃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বলুন । "সম্রাট" নামক সনেটটিতে আপনি লিখেছেন "গোপন ভারতবর্ষ । এই গোপন ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বলুন ।

উঃ ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে কোনও ধর্ম নেই, পুরাণ আছে; পঞ্চম বেদের পর উত্তর মহাভারত অবশ্য লেখা হল না - সবই লেখার নয় - আপনি যে ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন তা একেবারে নিজে জানতে হয় । বাংলা আপ্তবাক্য নয় তাই খানিক ইশারা দেওয়া যায় - এই পর্যন্ত; তবু একটু বলি যে গোপন ভারতবর্ষ এক দেবগণের আর অসুরের পর্যটনভূমি - ভারতবর্ষের গরিবরা, পথকুকুরেরা, এটা জানে । আগে এ পর্যন্ত বলি, যে, ৬৯ সালে পুরী যাবার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না । পরে, ৭৬-এ পাকুড় গিয়ে ধারণা আরও মজবুত হয়েছে ।

প্রঃ ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ফলে জানি, আপনি নেশা করতে ভালোবাসেন । খুব মদ্যপান করেন না, বরং শুকনো নেশার দিকেই আপনার ঝোঁক বেশি । গাঁজা আপনার দীর্ঘকালের সঙ্গী, ইদানিং আপনি নিয়মিত চরস খাচ্ছেন । আপনার লেখাতেও নানাভাবে এসবের উল্লেখ পাওয়া যায় । মনে হয়, নেশাটা আপনার অভ্যাসমাত্র নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু । মেডিটেশন, ট্রান্স বা ইনসাইট - নেশার কাছে এ জাতীয় কিছু পেয়েছেন কী? নেশা করে লিখেছেন কখনও?

উঃ মদ্যপানটা ষাটের শেষে যথেষ্টই হয়েছিল । কিন্তু ও পাট ছাড়তে হল - অর্থাভাব, লিভার--তারও বেশি সঙ্গী সঙ্কট । মদ খেয়ে নাচগানই . আমার কাম্য - কিন্তু আমার সতীর্থরা দেখি সাহিত্য সাফল্য বা বিষাদ আলোচনা করেন-- নানা সজল ও আগ্নেয় কথাবার্তা হয় । ফলে, শুকনো ধরি । এর এক সুবিধে যে নেশা-সঙ্গীরা ততটা স্নব স্টাফ পরিবেশন করেন না । কোনও কোনও লেখা সম্পূর্ণ নেশাহীনতা দাবি করে, কোনও লেখা নেশায় । কতকগুলি লেখাকে আমি দেখতে পাচ্ছি যারা আফিংখোর - যতক্ষণ আফিম না খাব তারা আসবে না আমার কাছে । একবার একটি লেখা দাবি করেছিল নগ্নাবস্থা । উপায়ন্তর নেই দেখেই জামাকাপড় খুলেই তাকে ধরতে হল - দুপুর, কাছেই এক কবি বন্ধু, কেউই নেশা করিনি । ইনসাইট, ট্রান্স, মেডিটেশন - সব যদি শুধু নেশা সাপেক্ষই হয় তবে দরকার নেই ওসবে । চরস আর খেতে পারছি না - স্বাস্থ্যকর গাঁজার সন্ধানে আছি । নেশা রেসিডুয়ালস কমপ্লেক্স কাটায়; ব্যক্তিগত জীবনে ভোগবাদী (ভোগবাদী বলতে আমি সামগ্রীপ্রিয় লোক বোঝাতে চাইছি না - প্রিয়জন ও জনপ্রীতিই সব থেকে বড়ো ভোগ) এবং কবি কিন্তু নেশা করেন না এ হলে কী হয় জানেন - কবিতা ও পদ্যের পার্থক্য তিনি ভুলে যান । উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, নিশীথ, বীতশোক, শঙ্খ... বা, একটা প্রবীণ ভঙ্গিমাকেই তিনি ধ্রুব পদার্থ মনে করেন - এই ধরনের মনকে জীবনানন্দই ঠাট্টা করে গেছেন - এরকম কবিও কম নয়! তবে যদি কেউ ভোগবাদী না হন তাহলে আলাদা--কারণ তাঁর নেশার প্রায় শেষ নেই ।

প্রঃ আমাদের দেশের সামাজিক রাজনৈতিক চিত্রটি ভয়াবহ । অসীম দারিদ্র, শোষণ আর দুর্নীতির এই দেশে একজন লেখক কী ভাবে তাঁর আত্মপরিচয় খুঁজে পান । একজন ভাবুক এবং বুদ্ধিজীবী এবং বিষণ্ণ প্রণয়ভুক হিসেবে এই পরিস্থিতিতে তাঁর ভূমিকাই বা কী? সমাজ চেতনার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কতটুকু? মার্কসবাদ বিষয়ে আপনার কী ধারণা? আমাদের দেশের কিংবা পৃথিবীর গরিবদের কথা মনে রেখে, আদর্শ সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র কাঠামো বিষয়ে আপনার নিজ মতামত কী?

উঃ এই দু'টি প্রশ্নগুচ্ছের জবাব একসঙ্গে দিচ্ছি । বিশ্লেষণ বাদে, মার্কসবাদ এক এথিক্স । হরলিক্স-এর মতোই, এথিক্সও মহান শক্তিদাতা, শুধু তারপর যেন কী সব হয় । আমি মানুষের মস্তিষ্ককোষ, ব্রেণ সেলস্-এর বিপ্লবের কথা ভাবি - অন্যতম কোনো বিপ্লবে আমার আস্থা নেই কেননা আমার বাগ্মীতা ছাড়া তার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই । ওই প্রকার বিপ্লব হলে, 'রাষ্ট্র' বা 'সমাজ' হয়তো শুধুমাত্র কবিতার শব্দের মধ্যে থাকবে কিন্তু তার অন্য লোকবাস্তবতা লোপ পাবে । আপনি "কবিতার কথা'পড়ুন । মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ দারিদ্র, শোষণ দুর্নীতি এবং সম্পদ সুনীতি মৈত্রী সব পছন্দ করে না হলে এসব আছে কেন । এইসব প্রশ্ন লেখকদের দিকে আসে আমি জানি - খানিকটা রগড় মারার ধান্দা আছে যেমন এ প্রশ্নে তেমন এ প্রশ্ন এ-ও জানে যে কবি আর মেষপালক মৃগপালকের পৃথিবীই আসল মানুষ পৃথিবী - কবিরাই বিনায়কদের মধ্যে 'ক' বর্গের ব'লে কবিনায়ক । সুসমাজ রচনা তবু এক সার্থকতা; কিন্তু কোনও সার্থকতা বা ব্যর্থতার সঙ্গে কবিতার তেমন কোনও যোগ নেই । কবিতার কাজ নয় মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা দেওয়া । বরঞ্চ তার কাজ বহুভাষী ও বিস্তর ভাষী মুখগুলিকে ম্লান ও মূক করা । জাঁ জেনের এই তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি সুপার এক্সসাইটমেন্ট গিভস রাইস টু মিরাকল; এবং যদিও কোনও কোনও কবিতা সুঘন তাপসতেজ ও কোনও কবিতা দৈবদ্যুতি - দুইই একইভাবে কাজ করে সেটা ইতরীকরণের বিরুদ্ধে । 'সমাজচেতনতা'র মতো একটা কাছাখোলা শব্দের সঙ্গে, কবি ও কবিতার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না । আমাদের এই কষ্টের দেশে যে কোনও লেখকের ভূমিকা এক প্রণয়ী বিষাদভূকের - বট, আমলকী, বেল, পাকুড়, নিম - এইসব গাছ মলিন বাতাস আত্মসাৎ করে আর টাটকা হাওয়া উপহার দেয় -এদের মতো প্রণয়ী, বিষাদভূক । লেখকের আত্মপরিচয়, ভাবুকতা, বুদ্ধিজীবিতা - এসব কোনো সমাপিকা অভিধা (অর্থাৎ বি.এ, এম-এ)নয়- হ'লে, ভারি অসভ্য কথা, আর বলবেন না । কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে যে আপনি জানতে চাইছেন জন অভ্যুত্থানে লেখক যোগ দেবেন কিনা । ১৯৫৯-এ পশ্চিমবাংলায় এক অভ্যুত্থান হয়েছিল; সকলেই তাকে দমন করেছিল । ১৯৬৬-র অভ্যুত্থানের কয়েকদিন পর বামপন্থী মহলে মৌরসীপাট্টা হয়ে যায় । ১৯৬৮-এর তামস সংখ্যা গল্পকবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন, "চিনের মুখপেক্ষী না হয়ে যদি আমাদের দেশ এমন কিছু হয় তাহলে সকলেরই তাতে যোগ দেওয়া উচিত । " এই পংক্তিটি যথারীতি উপহাসিত হল আমাদের সুসমাজমনস্ক শিবিরে যাঁরা কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলকে সার জানেন ও তার বাইরে গোটা দশেক মাদুলিকবচ কেন্দ্র বলে জানেন । সবই ভালো হয়েছে; রাশিয়া,আমেরিকা, চিন, ভিয়েতনাম - সবাইকে আরও বেশি করে জানা দরকার ছিল । আবার জনঅভ্যুত্থান হবে ১৯৮৬-তেই । এখন, লেখক নানারকম সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রেমচন্দ, জীবনানন্দ যেমন তেমন অন্য মানসিকতার লেখকও আছেন । পার্টি জিনিসটাই এখন আর কোনও গণাযুধ নয় - আসন্ন কোনো জন অভ্যুত্থান যদি এই কাণ্ডজ্ঞান ধরে রাখতে পারে (পারবে মনে হয়) তাহলে নিজেকে কোনও লেখক/অলেখক এসব কিছুই না ঠাউরে সেক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত যোগ আমার তো অনিবার্য মনে হয় । পার্টি এক প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ফর্মুলা মানে আর জনঅভ্যুত্থানের কোনও ফর্মুলা হয় না ।

প্রঃ 'রাত্রি চতুদর্শী' সনেটটিতে আপনি উষা উত্থুপ-গীত "ডিস্কো ডান্সার"হিন্দি ছবির একটি গানের কলি ব্যবহার করেছেন - "কঁহি ধুঁয়াহুঁহা নাচে নাচে আউয়া আউয়া" । ওরকম একটা কবিতায় এ জাতীয় প্রয়োগ, এককথায়, শ্বাসরোধকারী । মনে হয়, এটি কেবল একট কাব্যকৌশল নয়,আপনার চিন্তাপদ্ধতির একটি গোপন মাত্রা এখানে ধরা আছে । এ বিষয়ে কিছু বলবেন? আপনার তিনটি বই-এর মধ্যে 'রাত্রি চতুর্দশী' আমার সবচেয়ে প্রিয় বই । দেখতে পাই, বইটির ৭টি কবিতা জানুয়ারি ৮৩ এবং একটি মার্চ ৮০-তে রচিত, যেন সংকলনটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েই আপনি এই রচনাকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । এভাবে বইটি করার পিছনে আপনার কি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল?

উঃ আমি প্রতিশ্রুত যে, এই লেখাটির বিষয়ে কিছু বলব না । এছাড়া যে ওটি ৮২-র কালীপুজোর রাত্রির অনুষঙ্গ জড়ানো । 'রাত্রি চতুর্দশী' একেবারেই তাই, - ৮২-র ডিসেম্বরে ভাবি যে কর্মটি করব । এদিকে, সনেট শুনলেই ড্রেসিং গাউনের কথা মনে পড়ে, তখন ঠিক

করি যে সব মাল চোদ্দয় নামাব । এটা করা দরকার বলে মনে করি, কেননা আমাদের সাহিত্য-অগ্রজরা খামোকা অনেক বোকা বোকা কথা বলছিলেন আমাদের বিরুদ্ধে । সুনীলও শান্তিনিকেতনে বলে এলেন আমরা কেউ ছন্দ জানি না । আরও নানা কথা বলছিলেন শিবনারায়ণ রায় - 'কথারা তোমার মন'নামক এক অতি দুর্বল কুপদ্যগ্রন্থের জনক । এঁর পদ্যজ্ঞানও যথেষ্ট - মন তুমি কৃষিকাজ জানো না-র মতো সহজবোধ্য রূপক অলঙ্কারকে বলেন উৎপ্রেক্ষা (দ্রষ্টব্য আয়োজন পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৯১) । তা, আরও কিছু সাহিত্য প্রশাসকরা তরুণদের মধ্যে থেকে এক কবিকে নির্দেশ করে, “এই তোমাদের ফার্স্ট বয় আর সব পাশ করতে পারোনি” বলছিলেন / তাই সনেট! কবিতার ডেকোর-কেই ফর্ম বলেন এমন আকাট আমি দেখেছি অনেক... তা সোজা কথা, লেখা ভালো লাগে না বলে বেড়ান ঠিক আছে । টেকনিক নিয়ে ওস্তাদি বলবে না প্রিয়... বই যতবারই এ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশের তাগিদে করিনি - নানা নোংরা উদ্দেশ্য, এর তার ল্যাজে পা কি কারো পাকা ধানে মই দেওয়া এইসব কারনেই করেছি ।

প্রঃ আপনার ‘দেবী’ এবং ‘রাত্রি চতুর্দশী’ দুইটি পরিষ্কার থিমকেন্দ্রিক, যাতে আপনার দীর্ঘদিনের অসংখ্য কবিতা রাশির কোনোটাই ঠাঁই পেল না । অবশেষে ‘টেবিল, দূরের সন্ধ্যায়’ আপনি নানারকম কবিতা রাখলেন, লক্ষ করলে বোঝা যায়, এই বইটি-ও নাম-কবিতাটিকে ঘিরে, শেষ পর্যন্ত থিমেটিক । এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু দেখা গেল, দীর্ঘ ৭ বছর (১৯৭৭-১৯৮৩) রচনাকাল থেকে নির্বাচিত মাত্র ১৭টি কবিতা - এই যেখানে মোট পরিসর, সেখানে আপনি একটি দিনে (৯.৮.৮৩) রচিত চারটি কবিতা এবং ১৩.৮.৮৩ রচিত একটি কবিতা অর্থাৎ ৫ দিনের রচিত ৫টি কবিতা অন্তর্ভূক্ত করলেন । এই ব্যাপারটা আমাকে একটু বিমূঢ় করে । এবিষয়ে আপনি বলবেন কি কিছু?

উঃ থিম শুনলেই মিউজিক মনে পড়ে - আর মিউজিক আমি ফেস করতে চাই না । এই বইটায় আমি চেষ্টা করেছিলাম - যাতে যৎসামান্য তৎসম শব্দের যৎসামান্য অলঙ্কারের আর প্রায় ছন্দবর্জিত লেখা রাখা যায় । ওই ৫টার বদলে অন্য কিছু রাখা যেত - কিন্তু কুঁড়েমি ছিল আর ভয় ছিল যে কোনও সমুদ্ধত কপিরাইট লেখা তো রাখা যাবে না - ছন্দভঙ্গ হবে - অবশ্য ওই পাঁচটাতেও গ্রন্থছন্দ টাল খেয়ে গেছে । এই ৫টা গৌতম বসুকে টুকে লেখার চেষ্টা । ভেজা, ছোটো ছোটো রোমে ঢাকা থাবা যার কিছু অংশ গোধুলিপটলে কিছুটা সন্ধেয় - সেই সব থাবা আমি যে যে লেখাতে পেয়েছিলাম তাই জড়ো করে এই বইটা ।

প্রঃ আপনার কবিতা পড়ে মনে হয় আপনি অনুপ্রেরিত হয়ে হয়ে লেখেন, সাধারণত একবার বসেই সম্পূর্ণ লিখে ফেলেন, এবং বিশেষ কোনো পরিমার্জনায় বিশ্বাস করেন না । আমি কি ঠিক বলছি?

উঃ কখনও তাই, কখনও তা নয় - আসলে অনুপ্রেরণা, প্রেরণাহীনতা, পরিমার্জনা ও অ-মার্জনা সবেতেই প্রভূত বিশ্বাস আছে! কোনো লেখার আচরণ পরির মতো, তারা মার্জন চায় - মার্জিত পরি তারা, মার-জিতও বা,কিন্তু কোনও কোনও লেখা চায় অমা+অর্জন ।

প্রঃ 'পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা' - এই পংক্তিটিতে এবং অলোকরঞ্জনের কবিতাটিতে আপনি কোন ছন্দ নির্দেশ করেন? কেন?

উঃ ১) পংক্তিতে ছন্দ বোঝা যায় না, এই পংক্তি পয়ার-ও হতে পারে - ৮+৪! “একা"নামী এই কবিতার অন্তত ২ পংক্তি ধরুন “পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা/ ত্রিজগৎ রুষ্ট যখন ভ্রুকুঞ্চিত . . . এর ছন্দ প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন জানিয়েছেন ৩+৪+৪ এর স্বরবৃত্ত । অর্থাৎ, পাখিটির-৩ বা ত্রিজগৎ-৩, মাতৃভাষা বা রুষ্ট যখন-৪, চেয়ে থাকা বা ভ্রুকুঞ্চিত-৪ । চট ক'রে মনে হবে যে অলোকরঞ্জন ঠিকই বলেছেন,

কারণ এই কবিতাটির প্রত্যেক প্রথম স্বরবৃত্ত ওজনে ৩ ইউনিট । অলোকরঞ্জন বলেছেন বলবেন যে আদ্য-অতিপার্বিক ৩ ও বাকি দুই পূর্ণপর্ব ৪ এই নিয়মে লেখাটা এগিয়েছে । যদিও এ বিষয়ে আমি এক বিশাল চিঠি এই ক্ষিপ্রনির্দেশন বিপ্রতীপে তুলছি ১) ত্রিজগৎ/একলা যখন/. . . এখান, ত্রিজগৎ=৩, cc to অলোকরঞ্জন বা যে কেউ । বেশ, ওটাকে 'ত্রিবিশ্ব' ক'রে পড়ুন তো! ত্রি-বিশ্ব-ও স্বরবৃত্তনিয়মে ৩ । ২) আমি বলতে চাই যে, "পাখিটিরই মাতৃভাষা চেয়ে থাকা' - এরকম লিখলেও, (বাকিটা একই থাকবে) ছন্দপতন হত না এবং স্পষ্টই বোঝা যেত যে এটি ঠিক স্বরবৃত্ত ছন্দ নয় । ৩) এবার, পড়তে বলছি "পাখিটির/মাতৃভাষা/ চেয়ে থাকা/বিশ্ব একলা যখন । ... এতেও, ছন্দপতন হবে না যদিও "বিশ্ব" স্বরবৃত্ত ওজনে ২ । 'হাবুদের তালপুকুরে/বাবুদের ডালকুকুরে/সেকি বাস্ করলো তাড়া' - এর ছন্দ স্পষ্টই "এই খেলাটি একলা আমার, খেলব যেমন চিরকালের'-এর থেকে আলাদা । আরও উদাহরণ "উঠবে/টাটকা ইলিশ/হরি বলো/মন রসনা/ তবে এ/মাছ গাঁথতে/বাবু যেন ছিপ ভাঙে না!" অর্থাৎ, আমার নিবেদন - যে ছন্দের কথা আমি বলছি তার মূল পর্বের কথা বলছি পাখিটির মাতৃভাষা/হরি বল মন রসনা/ত্রিজগৎ একলা যখন/তবে এ মাছ গাঁথতে/উঠিবে টাটকা ইলিশ-এগুলো একটিই পূর্ণপর্ব । অলোকরঞ্জন এখন বলতে পারেন যে তিনি এদিকে ধাবিত হননি, ৩/৪/৪ এর প্যাটার্ন মাথায় ছিল । কিণ্ত আদ্যআতিপার্বিক যদি ছন্দের চরিত্র বদলে দেয়? আমরা এটাকে নয়মাত্রা বলতাম মুখে মুখে কিন্তু ওভাবে বলা যায় না জিনিসটার মধ্যে মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত এবং প্রস্বরের কাজ আছে, বেশ জটিল ও উৎসাহজনক, এই ছন্দ । ছন্দটির নামকরণ এখনও হয়নি । আর একটা নমুনা দেওয়া যাক: অর্ধপর্বে । রেখে পূর্ণপর্বে । । রেখে এই খে/লাটি । । একলা । আমার ‖ খেলবো । যেমন চির/কালের । ।--১ম পংক্তি, চক মি । লানো । । খেলছে । বাড়ি, । ।যার আ । লোকে । ।মানুষ । কানা| । -২য় পংক্তি নির্ভুল স্বরবৃত্ত । এবার পড়ুন: খেলাটা । একলা আমার, ‖ খেলবো--| যাবচ্চন্দ্র । ‖ -১ম পংক্তি, খেলে বাড়ি । চকমেলানো, ‖ আলোকে । মানুষ অন্ধ-২য় পংক্তি । দ্বিতীয় নমুনার তালাটাই "একা" কবিতায় আসছে । আর একটা কথা বলি যে আদ্যঅতিপার্বিক ৩ ও পরের পূর্ণপর্ব ৪ হিসাবে স্বরবৃত্ত হয় না, কারণ তাহলে, পাখিরা/চলে গেছে'/প্রশান্ত/যাবে মেসে -এহ ছন্দপতনকে গ্রাহ্য করতে হয় । যাক গে, পুরো বৃত্তান্ত পরে পাবেন । আপাতত/নিন বিতর্ক, এরপর,/পাণ্ডিত্য--/কি নিয়ে/গড়ে উঠে । দলত্যাগী/ ভিনবৃত্ত ।

প্রঃ অনন্যসাধারণ গদ্য লেখেন আপনি । যে বিরল কয়েকজন লেখকের গদ্য আমি অন্ধ অনুরাগীর মতো পড়ি, আপনি তাদের একজন । আপনার নিজের প্রিয় গদ্যলেখকদের নাম জানতে ইচ্ছা করি । ইদানিং জীবনানন্দের যে গদ্যগুলি প্রকাশিত হচ্ছে এগুলিকে আপনি গদ্য বলবেন না কবিতা বলবেন? প্রসঙ্গত, কমলকুমারের গদ্য খবরকাগজের গদ্য থেকে একেবারেই আলাদা ক'রে চেনা যাচ্ছে না তার একটা কারণ হয়তো এই যে বর্তমানে যাঁরা গল্প উপন্যাস লেখেন তারাই খবরকাগজে লেখেন, এই ট্রেন্ড বাংলা গদ্যের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক ব'লে আপনি মনে করেন?

উঃ হাতেম তায়, কবির শিরোমণি, গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা- ঈশ্বরচন্দ্র, কৃষ্ণকমল, নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে অবনী ধর পর্যন্ত অনেক নাম বলতে হয় - শরদিন্দুকে বলবই, শিবরাম । শক্তির গদ্যরীতি ভারি বিলাসী চমৎকার - উচ্চাভিলাষী না হলেও । জীবনানন্দ পদ্য ও গদ্যের ভেদটা ভাঙতে চেয়েছিলেন - উচিত কাজ, কিন্তু সবটা পারেননি কারণ যেমন মিল দেবার মিহি লোভ ছিল ওঁর তেমন গদ্যে একটা আবছা লোভ ছিল চরিত্রায়নের - তা, লিখবেন, একটুও হড়কাবেন না, সে কি হয় । কমলকুমার, জীবনানন্দ, সতীনাথ - এঁরা কাব্য লিখেছেন - গদ্য লিখেছেন একথা ঠিক নয় । প্রচারিত সমাদৃত হবার তাগিদে যে গদ্য লেখা হয় (পদ্যও) তাকে খবরের কাগজের ভাষা মানতেই হবে - খবরের কাগজের ক্রেতা পাঠকবৃন্দ আছে, সাহিত্যের আছে পাঠকসমাজ । আর, এই ট্রেন্ড কিছু বিপজ্জনক নয় । খবরের কাগজ মানে ঢ্যাঁটরা । কোনো ঢ্যাঁটরাই সূক্ষ্মতা বা nuances নিয়ে কাজ করতে পারে না ।

প্রঃ আপনার কবিতা কৃষ্ণবিদ্যুৎ। কালী-গঙ্গা-শ্মশান-ডোম সব এই বিদ্যুৎলতায় গেঁথে থাকে। কমন মুদ্রার আশ্চর্য দক্ষতার আড়ালে, কবিতাগুলিতে টের পাওয়া যায় এক পাথরচাপা অস্থিরতা, রক্ত। মনে হয় যেন, এক ধরনের অসহিষ্ণুতা থেকে, ভায়োলেন্স থেকে আশ্চর্য সব পংক্তি রচনা করেন আপনি। যৌনতার শেষ রাতের চিতা ধিকধিক জ্বলতে থাকে আপনার লেখায়। সব মিলিয়ে এই কাব্য শরীর চণ্ডালিনীর মতো বাঙ্ময় এবং আকর্ষক, কেবল একটু যেন বিষাদস্পর্শের অভাব। আপনি কি এই সূত্রে দু'চারটি কথা বলবেন?

উঃ অনেকরকম 'বিষাদ'আছে কয়েক ধরনের বিষাদের প্রচলনে বা কিছু প্রচলিত বিষাদে, আমার আস্থা কম। জ্ঞানত, রাশি রাশি সাব স্টাফ লিখে Jeremiah ব'নে যেতে চাই না আমি - যদিও এমন অনেক লেখক বাংলা ভাষায় বেশ জনপ্রিয় ও গণ্য। আমি লেখাকে একটা ঝুঁকির কাজ ব'লে জানি আর অনেক বিষাদই কোনও ঝুঁকি নয়, ঝোঁক মাত্র। যে বিষাদবিধুরতা অনেকেই লতা কি কিশোরকুমারের কোনও কোনও গানে পান - সেইসব গানে যা আছে তা হল সরলীকরণ, সুরের। এই সরলীকরণ জিনিসটাতে বিধুরতা মাখালেই এক পবিত্রতার মায়া পাওয়া যায়। এর বিরুদ্ধেই ছিল আমার মন - পরে নানা হিসেব কষে আমি দেখলাম যে সোনার তরী যদি বিষাদ নাও হয়, বিদায় দাও খেলার সাথী, বিদায় দ্বার খোলো গেল যে খেলার বেলা - এই বিষাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো যুক্তি নেই! কিন্তু, অঙ্ক ঠিক আছে, সরলীকরণ আছে এখানেও। এর চর্চা আমি বেশ করিনি--এ জিনিস আমার দ্বারা এখনই হওয়া সম্ভব না, আমার বাল্যকাল খেলাবিহীন, -শশ্মানগঙ্গার ধারে কাটানো। আমি আপনার 'বিষাদ' শব্দটাকে শান্ত আনন্দ, যাকে আপনি যথাথই লিখেছেন শিবস্পর্শটুকু হিসেবে ধরে নিয়ে (শান্তায়ন নয়) প্রায় অনেক আগেই বলেছি এ জিনিস আমি পারিনি। কিন্তু এ যদি হয় যে নিজের সঙ্গে বসন্ত ঋতুর ওই রূপকটা ঠাট্টা না হয়ে খেটে গেল তবে হয়তো কিছুদিন বাদে এই বিষাদ আসবে, কারণ শেষ বসন্তের মতো এমন বিষাদ তো আর প্রকৃতিতে নেই।

অনেকরকম 'বিষাদ'আছে কয়েক ধরনের বিষাদের প্রচলনে বা কিছু প্রচলিত বিষাদে, আমার আস্থা কম। জ্ঞানত, রাশি রাশি সাব স্টাফ লিখে Jeremiah ব'নে যেতে চাই না আমি - যদিও এমন অনেক লেখক বাংলা ভাষায় বেশ জনপ্রিয় ও গণ্য। আমি লেখাকে একটা ঝুঁকির কাজ ব'লে জানি আর অনেক বিষাদই কোনও ঝুঁকি নয়, ঝোঁক মাত্র

প্রঃ সদ্য তরুণ, অচেনা কবিদের লেখার মধ্যে থেকে প্রতিশ্রুতিবানদের চিনে নিতে আপনার জুড়ি নেই। বহু নতুন কবির নাম এবং সম্ভাবনার কথা আপনার মুখেই প্রথম শুনেছি, এবং পরে তারা দ্রুত চতুর্দিকে সমাদৃত হয়ে উঠছেন, এটা দেখেছি। আপনি

তরুণদের লেখালেখির একজন অত্যন্ত মনোযোগী এবং অভিজ্ঞ পাঠক। তাই জিজ্ঞেস করি, এদের লেখার মধ্যে কী কী ধরনের প্রবণতা বা টান আপনি লক্ষ করেন? এগুলির বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মতামতই বা কী? সব মিলিয়ে, তরুণদের লেখা আপনাকে কতখানি উদ্দীপ্ত বা আশ্বস্ত করে?

উঃ উৎপল বোধহয় আরও ভালো পারেন এ কাজটা ... গৌতম বসু, সংযুক্তা বন্দোপাধ্যায় এঁরাতো ওঁরই উপহার। আরও বলব এ কারণে যে এ বছর অভিরূপ সরকারের বইটা আমি তো প্রথমে প্রায় এড়িয়ে গিয়েছিলাম - উৎপল বলেন ফের পড়তে - খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই । কই, সঞ্জীব প্রামাণিক তো সমাদৃত হলেন না তেমন? অল্পবয়স্ক লেখকদের অনেকরকম গুণ আছে এবং তা এত বিভিন্ন কোটির যে অল্প কথায় সেসব একটুও বলা অসম্ভব মনে করি। বরং এঁদের বিরুদ্ধে তিন-চারটি বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে আমার - এমন কি বীরত্বের দিক থেকে অতি পৃথক এবং অতিনবীন অপাবৃতার প্রতি - তবু সেসব আরও কিছু সময় না গেলে পেশ করতে সংকোচ বোধ করি । কবিতা, সর্বপ্রকার প্রবণতা বা টান থেকে মুক্ত, তার মানুষী মুসাবিদ কিছু সুবিধের কারণে কোনও-কোনও প্রবণতা বা টানের অভিনয়মাত্র করে- ত্রুটিপূর্ণ কবিতা হ'লে তখন সেসব নিয়ে কথা পাড়া যায় - কবিতা বা কাব্য একটু বেশি টঙ্কারময় জিনিস - কাজেই তা উদ্দীপ্ত করে, আশ্বস্ত করে না । এই জন্যে অল্পবয়স্ক কবিরা ভালো গদ্য লিখলে বাড়তি আশ্বস্তি পাই - কারণ অল্পবয়স্ক গদ্যকাররা কবিতা ভালো লেখেন না ।

প্রঃ বিশ্বকর্মা প্রেস । আপনার বাড়ির কাছে এই ছাপাখানা থেকে গত কয়েক বছর আপনার হাত দিয়ে বেশ কিছু কবিতার বই ছাপা হয়েছে, যার অধিকাংশই এই সময়ের বিশিষ্ট তরুণ কবিদের বই, এসব বইয়ের পাণ্ডুলিপি গোছানো থেকে শুরু ক'রে ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদ এর তদারকি এবং সবশেষে বিলিবন্টন পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলি আপনি প্রায় একা হাতে নিঃশব্দ পরিশ্রমে করেছেন এবং এখনও ক'রে চলেছেন । নানা ধরনের কবিতার বইয়ের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ এবং ঘর্মাক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কোনো বিশেষ মন্তব্য আমাদের বলবেন কি? প্রসঙ্গত, এই বইগুলি, যাদের আয়তন প্রায়ই ১৬ থেকে ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে, এগুলি শীর্ণতার কারণে আদৌ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য কিনা, এই প্রশ্ন নানা মহলে শোনা গেছে, একজন প্রতিষ্ঠিত অগ্রজ কবিও একই সংশয় প্রকাশ করেছেন । আপনি এর উত্তরে কী বলবেন? কবিতার 'সংকলন' এবং কবিতার 'গ্রন্থ' - এই দুটিকে আপনি ঠিক কী ভাবে তফাত করেন? দু'একটি উদাহরণ দেবেন কি?

উঃ হ্যাঁ, অনেক কবিতার বইয়ের তত্ত্বাবধানে খানিক জড়িয়ে থাকা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে - বহুপ্রুফদর্শী হয়েছি । আগে ম্যাগাজিন, '৭০ থেকে বই .এসব কাজ নিঃশব্দ হতেই হয় - প্রেসে আমি রস পাই । যদিও, আর বেশিদিন এ জিনিস আমি করছি না । অভিজ্ঞতাগুলি মজার, শেষে বলছি । কবিতার বই ১২ পাতায়ও হতে পারে, যদি, কবিতার মধ্যে ফিচারের অংশ কম হয় - বিনয়ের প্রথমদিকের বাঁশপাতা কাগজে ছাপা পুস্তিকাগুলি, গ্রন্থ । পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখে, গ্রন্থ বোধ হয় না । বাগ্‌ রীতি ছাড়া অন্য কোনো সূত্র নেই যে সম্পুটের, তাকে কেন বই বলব - সে ১২ বা ৭২ পাতার যাই হোক সে কবির আদর্শ বা দর্পণ বিলাস ।অন্য- গ্রন্থ থাকলেই, বই । কৃশতার যুক্তিটা যুক্তিবোধের দিক থেকে একই সঙ্গে শীর্ণ এবং স্থূল, একটা তিমি যদি বলে যে ডলফিন কোনো প্রাণীই নয় - তাহলে আর কী হয় - মজা হয় । ওইসব চতুর সংশয় আমি জানি - আসলে সংশয় এই যে, বইগুলো যদি আর একটু বাড়ত তাহলে হয়তো লেখকদের বেশি দুর্বলতা ধরা পড়ত - পড়লে মজা হত! আমিও ত্যাঁদড়, সে মজাটি আমি পেতে দিচ্ছি না, হেঃ হেঃ । আপনার প্রথম বইটা বই, সাতবছর ধরেই বলছি । পরেরটি সংকলন । যদিও, দ্বিতীয়টিতেই এমন ৬টি লেখা আছে যা পূর্বতন বইটিতে নেই । কিন্তু প্রথমটির সর্বত্র এমন এক সমগ্রতা আছে'বইটি পড়ে এমন এক পূর্ণের বোধ হয় এখনও (খুব কম ক'রে বলছি) - যেটা হয় বইতে নেই । একটা বই আপনি থামাতে

পারেন না - থামাতে বাধ্য হলেও, তার মধ্যে, আপনি আছেন । একটা সংকলন যত দুর্মূল্যই হোক আপনি যেখানে খুশি থামিয়ে আবার শুরু করতে পারেন - মেজাজ খারাপ হবে না । বই হয়ে-ওঠা এক ভাগ্যের ব্যাপার, কারণ, থিম জিনিসটা স্কিম থেকে আসে না । বাংলা কবিতার অভিজ্ঞতা বলি, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের বইটা প্রেসে দিলাম - ওঁ'র একটি লেখা "আমি দেখেছি সেই স্বর্ণমন্দির' । ব্যাস,............ ! আর এখন, নির্মলের বইটার নাম 'সীতা' যেই ঠিক হলো - রাম রাও, রামলালা! তবে কি দেশ আমিই চালাচ্ছি?

কবিতাদর্পণ



চিরবনশ্যামবর্ণ প্রাচী

একরাম আলি

যিনি নেই, যিনি এ পৃথিবীতে অনুপস্থিত, কোনো কলমের বা তুলির আঁচড়ে তাঁকে ধরা যায় না । যত চেষ্টাই করা হোক, বারবার পিছলে বেরিয়ে গিয়ে তিনি ক্রমশ আরও বড়ো হয়ে উঠতে চান । টুকরো আর দৈনন্দিন যত ঘটনা এবং সেসবের স্মৃতি এবং অস্পষ্টতা, তাঁর কাজ আর কথা– তাঁকে অবিরাম উপকরণ জুগিয়ে যায় কিংবদন্তি হতে । বিনয় মজুমদার একটি কবিতায় খানিকটা ঢিলেঢালাভাবে হলেও এরকম একটি পংক্তি লিখেছিলেন– 'যখন সূর্যাস্ত হয় তখন সূর্যকে বেশি বড়ো মনে হয় ।' তার কাজ শেষ করে সূর্য ডুবে গেছে রক্তাক্ত আভা নিয়ে । এখন সূর্যাস্তের পর পার্থপ্রতিমেরই একটি কবিতার অংশ আমরা দেখতে পারি– 'এসব আমরা আগে দেখিনি । এখন দেখছি, কেননা সে/ মৃত্যু, কিংবা অন্য কোনো কাজে ঠিক এসময় আমাদের মধ্যে নেই' ।

যদি বন্ধুত্ব শব্দটিকে ব্যবহার করার অনুমতি পাই, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের বয়স তাহলে ছেচল্লিশ বছর । মাঝে দু-একবার সাময়িক ছেদ পড়েছে অবশ্য । কিন্তু গত ২৯ সেপ্টেম্বর সেই সম্পর্কে স্থায়ী ছেদ পড়ল নাকি প্রলম্বিত হল আমার একার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত, এখনও জানি না ।

বাংলা সাহিত্যের ছোট্ট আর গা-ঘেঁষাঘেঁষি জগতে ঢোকার শুরুর দিকে কোনো-এক দিন আমরা পরস্পরের মুখোমুখি হই । কফি হাউস-নামক এক অ্যাংলো-বেঙ্গলি দ্রোণাচার্যের আশ্রমে । পার্থ তখন অন্ধযুগ-কুলপুরুষ । সেই মুখোমুখিতে এই নবাগত সমবয়স্ককে ধারালো চোখের স্কটিশোত্তর ভঙ্গিতে তিনি জানান– অমুক কবিতায় চায়ের কাপে-র সঙ্গে অভিশাপে-র মিলটি তিনি লক্ষ্য করেছেন ।

কিন্তু বন্ধুত্ব– এটা কীভাবে হল? কীভাবে হয়?

বন্ধুত্ব– যদি ভুল না-বলে থাকি– এমন একটা সম্পর্ক, যা বিবর্তিত হতে হতে আজও টিকে রয়েছে তর্কমুখর সাংস্কৃতিক বন্ধনে । সে-সংস্কৃতি যেমন বা যে স্তরেরই হোক না কেন ।

পার্থ আমার লেখা বা চিন্তা সহ্য করতেন কিনা, করলে কত দূর, কোনোদিনই জানার কৌতূহল বা ইচ্ছে আমার হয়নি । তবে এটুকু বললে বাড়িয়ে বলা হবে না হয়তো– সঙ্গ পছন্দ করতেন । কারো কারো চেয়ে হয়তো-বা একটু বেশিই । আপাত-নির্বিবাদী ছিলাম বলে? হতেও-বা পারে!

পার্থ ছিলেন স্ববিরোধী, দোলাচলে ভরা, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত । আসলে তিনি ছিলেন আকাশে উড্ডীয়মান এক পাখি, নিজের অশক্ত ডানাদুটোই যার সম্বল । তবু, ওই অশক্ত ডানা সম্বল করেই ওড়াটা ছিল তাঁর বোঝাপড়া । বোঝাপড়া কার সঙ্গে? যদি বলি– নিজের সঙ্গে বাকি বিশ্বের? হ্যাঁ, তা-ই ।

সেবার বকখালি । উনিশশো সাতাত্তরের নির্জনতম বালিয়াড়ি । সেদিন সন্ধ্যা নামার অপেক্ষায় থমকে ছিল সময়, যেন জানাজানি হয়ে গেছে– এবার একটা-কিছু শুরু হবে-হবে । পার্থপ্রতিমের অন্তরাত্মা থেকে আচমকা ধ্বনিত হতে শুরু করে– ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি...

মাথা ঊর্ধ্বমুখী । কণ্ঠনালী গলা চিরে উঠছে, নামছে । বন্ধুদের উপস্থিতি এবং বুকের খাঁচা অগ্রাহ্য করে প্রগাঢ় আকাশে নিজেকে সে প্রাণপণ ছড়িয়ে দিচ্ছে– হোথায় উড়িতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস ।

সেদিন যে-গান আমরা দু-তিনজন শুনেছিলাম, তার আগে-পরে তেমনটা আর শুনেছি কি? কেউই না । কেননা, সে-গান ছিল আসন্ন সন্ধ্যার সঙ্গে, সমুদ্রের বিক্ষোভরাশির সঙ্গে, ঢালু আকাশের নির্লিপ্ততার সঙ্গে, পার্থর নিজস্ব বোঝাপড়া । তাঁর আরও দু-একটা গানের শ্রোতা কালীদা– আমাদের কালীকৃষ্ণ গুহ– আর আমি, এই সেদিন পার্থর স্মৃতিচারণের ফাঁদে পড়ে বোঝাপড়া শব্দটিতে একমত হতে পারলাম ।

দুই

তার আগে আর-একবার । উনিশশো ছিয়াত্তর । সেবার লম্বা আলোচনা– সকালে আমার মেসে, সন্ধ্যায় কফি হাউসে । বলতেই হবে, উৎসাহের অনেকটাই ছিল একা পার্থপ্রতিমের । কীভাবে এসপ্ল্যানেড থেকে বাস । বাসে কাকদ্বীপ । সেখানে কেনাকাটা । তারপর ফেরিতে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী । কিন্তু নদী পেরিয়ে কী, কেউ জানি না । বাস? নাকি সাইকেল ভ্যান? শুধু জানা ছিল– ওপারে কিছুদূর গেলে, ডাইনে, কাছাকাছি ফ্রেজারগঞ্জ নামে জেলেদের জন্যে ছোট্ট একটা বন্দর থাকার কথা । কিন্তু আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে অবশিষ্ট সুন্দরবনের দিকে । যেখানে বকখালি ।

আসলে আমরা অন্তত একবার বেরিয়ে পড়তে চাইছিলাম আত্মহত্যার কাছাকাছি কিছুর সন্ধানে । ঝাড়া হাত-পায়ে । কেননা সরাসরি আত্মহত্যা করাটা আমাদের নাটুকে মনে হয়েছিল ।

এক সকালে পার্থ মেসে হাজির । উত্তেজিত । যেন সবচেয়ে জরুরি কাজটা এইমাত্র করে ফেলা গেছে । ব্যাগ থেকে নড়বড়ে একটা টর্চ (বেঁচে থাকলে নড়বড়ে শব্দটির প্রতি তাঁর তর্কবাণ নিক্ষিপ্ত হতই ।) আর দুটো সদ্য-কেনা ব্যাটারি বের করে সিগারেট ধরালেন– দ্যাখো তো, ঠিকঠাক জ্বলছে কিনা ।

হঠাৎ টর্চ কেন! বলতে বলতে ঘষাঘষি চলছেই । খোলা, লাগানো, ফের খোলা, ছোট্ট বাল্ব খুলে আবার ঘুরিয়ে গুঁজে দেওয়া । একসময় জ্বলে উঠতেই শুধু টর্চের নয়, পার্থর চোখমুখেও বহুকৌণিক সাফল্য ঝিলিক দিয়ে উঠল ।

--আরে, লাগবে না? জঙ্গলের দেশ!

সেবারই জীবনে প্রথম আমি সমুদ্র দেখি । দেখব বলে নয়, নেহাতই পার্থকে খুঁজতে বেরিয়ে ।

হয় না, বহুপঠিত কোনো বই ফের পড়তে ইচ্ছে করে? কিন্তু খুলে মাঝখানের কোনো পাতা ওলটাতেই আচমকা একটা মুদ্রিত অংশকে বিপুল অপঠিত মনে হয়? অনেকটা তেমনই ।

যদি বলি– সমুদ্রকে আমি দেখেছি পার্থর অপঠিত অংশ হিসেবে, তাহলে পৃথিবীর তিনভাগ জলরাশিকে হেয় করা হয় । যদিও ঘটেছিল তেমনটাই । হয়েছিল কী, বকখালিতে পৌছই সন্ধ্যে গড়িয়ে । ফলে এক পান্থশালার চালায় আমরা আশ্রয় পাই । প্রচুর খাদ্য-পানীয় শেষ করতে মধ্যরাত গড়িয়ে যায় । ভোরে ঘুম ভাঙলে দেখি, তিনদিক-খোলা চালাঘরে আমি একা । পাশের বেঞ্চ ফাঁকা । তখনো আলো ফোটেনি । কোত্থেকে টানা শোঁ-শোঁ শব্দ । আসলে গর্জন । চারপাশে ঘন ঝাউবন । জনপ্রাণী নেই । সেই গর্জনের দিকে হাঁটতে থাকি । মনে হয়েছিল– পার্থ যদি কোথাও গিয়ে থাকে, ওই গর্জনের দিকেই গেছে । পায়ের নীচে বালিপথ, যা ক্রমশ উঠছে । আধো-অন্ধকারে আন্দাজে আর ভয়ে ভয়ে আমার হাঁটা । উঠছি, উঠছি । উঠতে উঠতে চোখ বাঁধের উচ্চতাকে ছাপিয়ে উঠেছে কী ওঠেনি– এমন সময় সামনে সুবিশাল তরঙ্গমালা, যা মনুষ্যদৃষ্টিতে আঁটে না । তখনকার জ্যোতি সিনেমার সেভেন্টি এমএম পর্দা গর্জন করছে । স্টিরিয়োফোনিক সাউন্ড-সহ ।

আলো ফুঠছে । সুর্য হয়তো উঠবে । বিপুল জলরাশিতে রংও ছড়িয়ে দেবে । কিন্তু ঠিক কোনখানে, জানি না । হঠাৎ বহুদূরের বাঁকে, বালিয়াড়ির শেষ সীমায়, কোনো-এক হোমোস্যাপিয়েনের নড়াচড়া । কেউ আসছে । হাত তুলে কিছু-একটা বলতে চাইছে না? নির্ঘাত পার্থ । এই বিশ্বাসে বাঁধ থেকে আমি নেমে যেতে থাকি । অসংখ্য লাল কাঁকড়া দ্রুত সরে গিয়ে পথ করে দেয় । নামতে থাকি । সমুদ্রের দিকে? নাকি পার্থর?

তিন

খুব বেশি ঘোরার সুযোগ হয়নি পার্থপ্রতিমের । যেটুকু হয়েছে, তিনি গেছেন এমন সব জায়গায়, যে-সব স্থান সাহিত্যসমাজের অনুমোদিত তো নয়ই– বরং উপহসিত । তারকেশ্বরে গেছেন কাঁধে বাঁক নিয়ে, কলসে শেওড়াফুলির গঙ্গাজল নিয়ে । গেছেন একাধিক পিরের দরগায় । গয়ায় । কোনো অজ্ঞাতনামা বুড়িমায়ের থানে কখনো-বা । কিন্তু কোথাও কোনো পার্থিব বা অপার্থিব কামনা নিয়ে নয় । এই জগতের, এই দেশের, নিজের অনতিদূরের, নিম্নবর্গীয় শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ নিতে । নিজেকে তাদেরই

একজন করে নিতে । এর মধ্যে সিউড়িতে দু-দিন আমরা ঘুরি । সেটা ছিল তাঁর নিজস্ব অভিযানগুলোর বাইরে এক ঘোরা । সাহিত্য-অনুমোদিত? বলা যায় । অনেকের সঙ্গে সেবার পার্থ সস্ত্রীক । এক সকালে সেখনকার সার্কিট হাউসের ছাদে উঠেছি । তিনতলার ছাদ থেকে ছোট্ট শহরটির নীচু বাড়িঘরগুলো গাছপালার আড়ালে । যেন বনভূমি । চারদিকে অভাবনীয় সবুজ । বালকের উচ্ছ্বাসে প্রায় লাফিয়ে উঠে পার্থ চেঁচিয়ে উঠেছিলেন– এ কোথায় নিয়ে এলে, একরাম! এ যে বাল্মীকির দেশ! সেই সার্কিট হাউসের অদূরে, ঢালু প্রান্তরে, ছবির প্রতিবিম্বের মতো ছোট্ট একটা চার্চ ছিল । শতাব্দীপ্রাচীন । কিন্তু পার্থর মনে পড়েছিল কবেকার বাল্মীকির কথা!

ভেবেছিলাম– যে ছিল একদা পর্যায়ক্রমে বালক, তরুণ, যুবক, প্রৌঢ়, অবশেষে রুগ্ণ এক বৃদ্ধ, সেই পার্থপ্রতিমের শবদাহের ধোঁয়াগন্ধ এখনো দু-একজনের নাকে-চোখে লেগে আছে যখন, তাঁর কবিতা নিয়ে একটাও কথা আমি বলব না । এখন ফাঁদে পড়ে গেছি । একটা কথা, প্রায় মন্তব্যের মতো করে হলেও, বলতে হয় । কী সেই কথা?

যদি নিজের কাজটাকে সহজ করে নিতে জাদ্দালের মতো অনায়াস ছুরি চালাই বাংলা কবিতাশরীরে, তাহলে এদিকে কাত হয়ে পড়বে দ্বিখণ্ডিত কবিতার নবআবিষ্কৃত চন্দ্রানুভূতিগুলি– যা আসলে তিরিশের দশকের কবিতারাশি । নানান তার বিকিরণ । সেসবের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জোরালো বিকিরণটি ছিল দু-শো বছরের ঔপনিবেশিক পাঠ ও নিজেদের বৈঠকখানা থেকে আসা । দশকের পর দশক ওই পশ্চিমা বিকিরণ বেড়েছে বই কমেনি । ভারতীয় বা হিন্দু ধূপের ধোঁয়ায় মিশে গেছে ইয়োরোপীয় বা খ্রিস্টান মোমবাতির আপাতনরম আলো, যার দাহ্যশক্তি বেশি । অনেক পরে উৎপলকুমার বসু তো লিখেই ফেলেছেন– 'খ্রিস্টানীকে ভালোবেসে অত্যধিক হয়েছি খ্রিস্টান । '

বাংলা কবিতায় এরপর থেকে যেখানে যেখানে সমাধিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে– সেসব সমাধি কোনো বৌদ্ধের নয়, বৈরাগীর নয়, মুসলমানেরও নয় । কফিনসজ্জিত খ্রিস্টানের । একই সঙ্গে দেখা গেল চার্চের জলরঙা অস্তিত্ব । আর ইয়োরোপীয় দর্শনের নানারকম কাটাকুটির একটা নকসা । এই পশ্চিমা বা খ্রিস্টীয় আবহে পার্থর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসত যদি বলি, তাঁর অবস্থান খুব দূরে সরে যাবে না । একটা কবিতায় তিনি লিখেছিলেন–

এই দ্যাখো বনমালা, শাখাবাস, ইনি দৌ, এই যে পৃথিবী...

এখানেই আছি

খোঁজো হে আকাশগঙ্গা, গয়াক্ষেত্র, চিরবনশ্যামবর্ণ প্রাচী

আরও স্পষ্ট করে 'যে দেবী বৈশ্যসুবর্ণ'-নামের একটি কবিতায়, যাতে উপাস্যকে বলি উৎসর্গ করার প্রসঙ্গ রয়েছে, তিনি লিখছেন– 'শোষক ও শোষিতের চরিত্র বুঝিবার জন্য, ইহার পর, আমার আর কোনও পাশ্চাত্য পুথির প্রয়োজন হয় নাই ।'

চার

পার্থপ্রতিম কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন? তার আগে জানতে হবে কুসংস্কার কাকে বলে । একে সংজ্ঞায়িত করাটা বেশ জটিল একটা কাজ । বিষয়টাকে তাই জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই ।

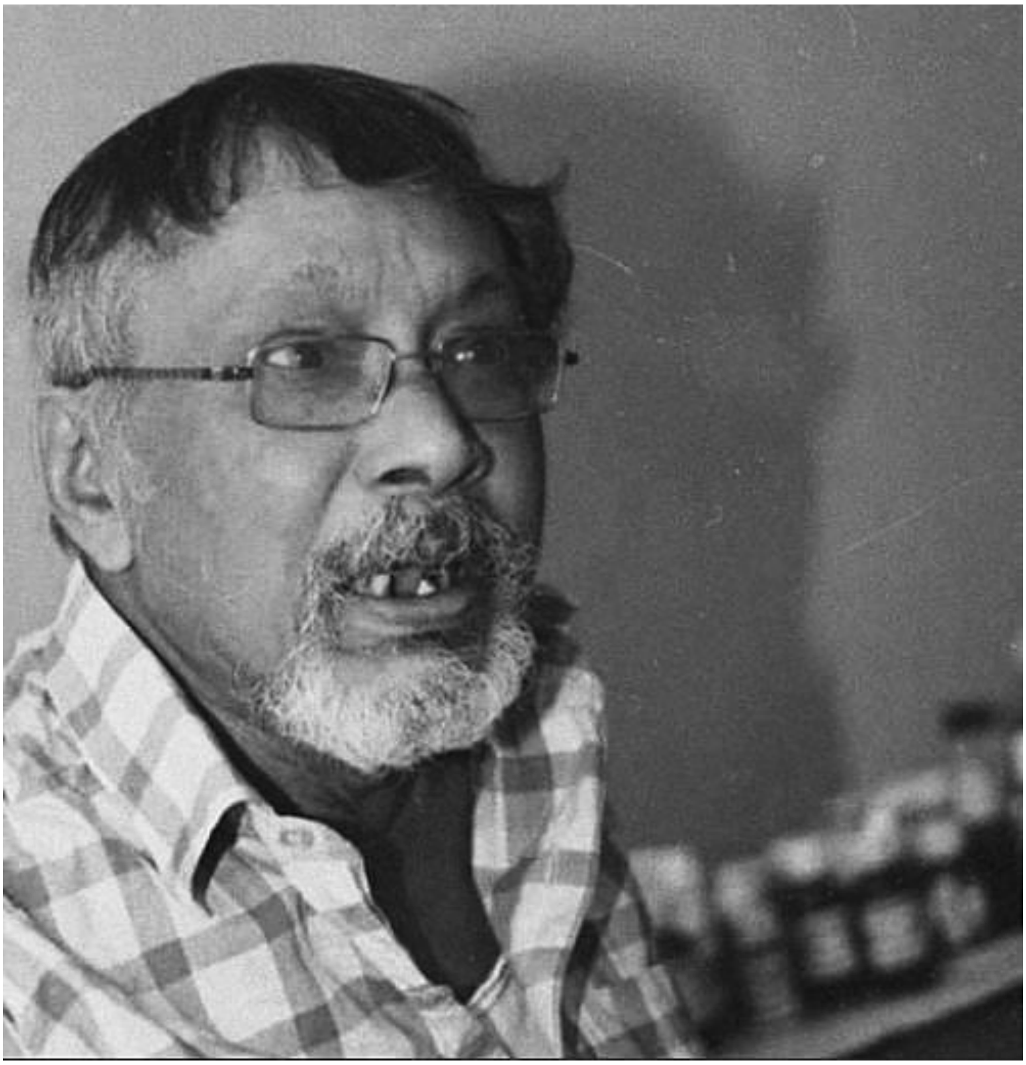
আমৃত্যু পার্থপ্রতিম রোগমুক্তির জন্যে আশ্রয় নিয়েছেন হোমিয়োপ্যাথির । নিত্যপাঠ্য বলতে পঞ্জিকা । খবরের কাগজ? বর্তমান । গ্রহরাশিতিথিনক্ষত্রে ছিল তাঁর বসবাস । এ হেন পার্থ সেই কবে, তরুণ বয়সে, নক্ষত্র থেকে নেমে এসে, আলবেয়ার কাম্যুর

একটি বইকে খুব গুরুত্ব দিতে চাইতেন– 'দ্য রিবেল' । তাঁর আফসোস ছিল– বইটি অসম্পূর্ণ । কেননা, সেখানে মহাশক্তিধর আমেরিকারূপী দেবরাজ ইন্দ্র অনুপস্থিত ।

সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বেঁচে থেকেও আমাদের পার্থ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, স্বনির্বাচিত একটা জীবন কাটিয়ে গেলেন । কোনো তারারক্তরসনির্গত কবিতার কথা এখানে পাঠককে পড়িয়ে বিব্রত করতে চাই না । শেষে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই– তাঁর পড়াশোনা, সংস্কৃতজ্ঞান, ছন্দ, তাসাবাদ্য, শব্দব্যবহার, ভাষা, বিষয়, ধূপনির্গলিত ধোঁয়া থেকে ধুনুচি নাচের উদ্দামতায় যেতে যেতে 'ডোম'-নামের একটি কবিতা এই কথাটি বলে রেখেছে :

রসাভিলাসিনী গঙ্গা, বটপল্লব, শিলা, বিষ্ঠা, মালাচন্দন, স্থানীয় মস্তান,
ভিখারি, মৃতদেহ, হরিধ্বনি, জিলিপি, চা, পুরানো কেক, ইলেকট্রিক চুল্লি,
দেয়ালে চক দিয়া নাম, খই, কলসী, ছাই, অয়েলমিল, বাঁশ-হাতে
চণ্ডালের সুখমুহূর্ত, উড়ন্ত অঙ্গার এবং স্নানকর্তৃক নগ্নতায় নড়িতে-থাকা
রমণী– এইসব উপাদানে যেসকল লেখা আমি তৈরি করি তাহা অনশ্বর
কি না প্রশ্ন থাকে । কেননা ইহার মধ্যে কফিন ও কবরের সুমিষ্ট
কূটতা নাই । ব্রিজ বা গঙ্গার দূরবর্তী বাঁক অধিকতর কি না, শ্মশানযাত্রীদের
বিশ্রামনিবাসে ইহা লইয়া আলোচনা হয় ।

(পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালকে, পার্থকে, সর্বনামে তিনি এবং সে ব্যবহারটি সচেতনভাবেই করা হয়েছে । আমাদের সম্পর্কের দোলাচলটি তাঁর অনুপস্থিতির পরও বেঁচে থাক– এই ইচ্ছেয় ।)



কবি ও কেরানির কেচ্ছা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

দিল যো না কহ্ সকা/ওহি রাজ – এ দিল

আলাপ হওয়ার আগেই শুনেছিলাম উনি একজন প্রতিষ্ঠিত কবি । রাজ্য শিক্ষা দফতরে চাকরি করেন । দুটি বই 'দেবী' ও 'রাত্রি চতুর্দশী' বোদ্ধাদের প্রশংসা পেয়েছে । তাঁর সঙ্গে কয়েকজন বন্ধুর যোগাযোগ ছিল । সেখানে আমার জুড়ে যাওয়াটা আজও কেমন যেন বেহিসেবি । বাজারে অনেক কিছুই তো মেলে না । তাই গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যেদিন জানালেন, চললাম, ভালো থাকবেন, তখনও তেমন কিছু ভাবতে পারিনি । আগেও অসংখ্য বার বহু বিষয়ে ওঁর কাছে এমন শুনেছি । কথার ফাঁকে স্মৃতির প্রসঙ্গ টানলেন । তারা নাকি অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় নিয়মিত জ্বালাচ্ছে । বললেন, শেষ দিকে সাধারণত এমনই হয় । একে গৃহবন্দি দশা । সঙ্গহীন, প্রায় একা, হোমিও-জ্যোতিষ ভরসা করে আছেন । তারা আর কত টানবে । তাই

আফশোসটা খুব নতুন ঠেকল না, শুধু ২৯ তারিখ সকালে দূরত্বটা বেড়ে গেল । সত্যিই মুক্ত হলেন । ভাবিনি, দিন পনেরো পর ফর্মায়েস পেয়ে তাঁকে নিয়ে কিছুটা লেখার পর সেটা মেশিনের গোলযোগে খোয়া যাবে । শেষ পর্যন্ত ওনার প্রয়াণের ঠিক একমাস পর বিষয়টা ধরা গেল । সবই তাঁর ইচ্ছা ।

তিরাশির গ্রীষ্মে প্রথম দেখা । সেদিন উনি হাটখোলায় জগদীশবাবুর সঙ্গে জ্যোতিষ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে এলেন । পরনে গরদের পাঞ্জাবি–ধুতি, গর্দানে পাউডারের হালকা প্রলেপ । জগদীশ-ফেরত চায়ের আড্ডায় ভাগ্য বিষয়ে সরাসরি আমার মত জানতে চাইলেন । তখন নিজেকেই ঠিকঠাক বিশ্বাস করতে শিখিনি, সেখানে ভাগ্যর মতো চিরসাথীকে কী করে সামলাব জানি না । ফল, খেলাটা খোদ জগদীশের ওপরেই ছাড়লাম । উনি নাছোড় । বুঝলাম, এখানে নিজেকে মূর্খ মেনে পার পাব না । শেষ পর্যন্ত এই অজানাকে নিয়ে উনি নানা ভাবে বহু বার বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন, যা একান্তই আমার । গত সাঁইত্রিশ বছরে চারপাশে অনেক কিছু পালটেছে । আমার ক্ষেত্রে বয়সটা বেড়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোনও হেলদোল হয়নি, যেটা উনি সবিনয়ে মানতেন ।

যাঁর কবি কেরিয়ার কংগ্রেস আমলে আর বাম জমানায় চাকরি জীবন শুরু, তাঁকে প্রথম পর্যায়ে বিশেষ সুবিধাভোগী ভেবে খুব একটা নম্বর না দিলেও ক্রমশ দেখলাম, তিনি বেশ পাকা খেলোয়াড় । ঢের আগেই মাজমের সঙ্গে পরিচয় । আলাপ জমল, বাড়ল হৃদ্যতা । সম্ভবত আমাকে যথেষ্ট ইতর জেনেই আংশিক বিশ্বাস করতেন । আমার থেকে তেরো বছরের বড় । ফলে কিছুটা কর্তৃত্ব আমিও মেনে নিলাম । যেটা অত্যন্ত অবাক করল, আমাকে একটা আকার দেওয়ার আন্তরিক চেষ্টা । এখানে ওঁর মতামত টানছি না । যত দূর দেখেছি, কোনও প্রতিষ্ঠিত বাঙালি চট্ করে এই চক্করে যায় না ।

সেই দিনগুলোতে ধর্ম ঈশ্বর পূজা, কংগ্রেস সিপিএম রাজনীতি, চাকরি গ্রহশান্তি হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে প্রবল মতভেদ চমৎকার আড্ডার পরিসর গড়ে দিয়েছিল । সে ঠেক স্থান-কালের বেড়া ভেঙেছিল তো বটেই, পাশাপাশি চেনাজানা অনেকের মনে নানা সন্দেহ ঢেলেছিল । এক সন্তানের পিতা তিনি এসবে আরও ফুর্তি পেতেন । বিভিন্ন বিষয়ে এতটাই গভীর থেকে টেনে অগাধ ঐশ্বর্য মেলে ধরতেন, তার জেরে অনেকেরই মতিচ্ছন্ন হতে বাধ্য । সেগুলো আমার মতো নির্বোধের বিপুল হর্ষ উৎপাদন করত । তাতে ওঁর সরল প্রশ্রয় মিশে যেত । দু-একবার যে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করিনি তা নয়, সেখানেই উনি নিপুণ সাধুতায় বিস্মিত হতে শেখাতেন । আমার কাছে সেই ভাঙাগড়া ছিল আকর্ষণের । শিক্ষক নন, এক প্রতিষ্ঠিত মানুষ সবিশেষ আন্তরিকতায় শিক্ষাসূত্র হয়ে হাজির ।

চুরাশিতে রাত্রি চতুর্দশী দিলেন । সঙ্গে আক্ষেপ, নামটা পাত্রী চতুর্দশী হলে জমত । পাঠকের দিকটা না ভেবে বই বের করার মানে হয় না । অসহ্য, ফের যাপনে ইঙ্গিত । চেপে গেলাম । বই উল্টে দেখি, অতি পরিচিত অজগর পুরোহিত ও কল্পনা আয়ারের ডুয়েট - ঈশ্বর তোমাকে জেনেছি মলমূত্রবৎ । গঙ্গাতীর পছন্দের জায়গা । ইতরসঙ্গ উপভোগ করেন । তা বলে এত বড় উপহার আশা করিনি । চাকরি পাওয়ার পর কবি পরিচিতি ভাঙিয়ে বাম-তোষণের তত্ত্ব এখানে অবাস্তব । বইয়ের নাম দেখার পর বাবুরা ছুঁয়েছেন বলে মনে হয় না । কবির আক্ষেপের কারণ স্পষ্ট । তখনই আগামী কর্মজীবন কীভাবে পার হবেন, তা নিয়ে চিন্তিত । গোপন ভারতবর্ষর জল-হাওয়া সকলের সহ্য হয় না, ভাবনা সেটাই । বাস্তবে খেলাটা আম্পায়ার বা রেফারিকেও ওপেন ইন্ডিয়ার কোর্টে ঠেলে দেয় । বয়স বাড়লে যা হজম করা আরও কঠিন । ভবিষ্যদ্বাণীতে নিখুঁত ছিলেন, গ্রহ-নক্ষত্ররা পড়তে পারেনি ।

স্বল্পমেয়াদি কলেজ জীবনে দু-একটা বিষয় জেনেছিলাম । বাম-বন্ধুদের ডাকে মিছিলে, আবার কংগ্রেসি বন্ধুদের কথায় তাদের মিটিংয়ে হাজির থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল । এতে ক্ষমতাসীন বামেরা বিরক্ত হয় । তাদের কাছে শুনতাম, অমুকদা খুব বড় নেতা । সকালে নিজেই ধুতি কাচেন । তার পর চলে মত ও পথের চর্চা । অথচ রাজনীতির কোনও স্বচ্ছ ধারণা তারা দিতে পারত না । প্রশ্ন নয় । বুঝেছিলাম, ওই ধুতিপরা ডন কিয়টেগুলোর খয়ের খাঁ হওয়া অসম্ভব । তার থেকে ওরা খ-এর ছা মানলে লাভ আমারই । মদনাগুলো ঘাঁটাবে না । পরে অনেকের দুশ্চিন্তায় জানা গেছে, ওই সময় সিপিএম ছেড়ে পার্থপ্রতিম ধরাটাই নাকি ইহজীবনে ঐতিহাসিক ভুল । তবে বাঙালি হিসেবে মনে করি, অদৃশ্য মতবাদ ছেড়ে জ্যান্ত মানুষ ধরাটা খুব বড় অন্যায় নয় । যেখানে রাজ্যের বড় অংশের জনগণ স্থির-বিশ্বাসী, সেখানে আমি তো কোন ছার । বঙ্গে থাকব আর কপাল সঙ্গে থাকবে না, এমনও হয়!

এহেন দিনগুলো কাটছিল কিছু রোজগার আর বাকিটা ইতিউতি ফুর্তির ঘোরে । পঁচাশি, জানুয়ারির শেষ দিকে শিবপুর ট্রামডিপোর মাঠে কাওয়ালির আসর । সেখানে পার্থদার আব্দার ও উদ্যোগে বেশ দামি টিকিটে রাতভর মধুর মজা লিতে কয়েকজন হাজির । মাঝরাতে বড়কর্তা গোছের লোকজনের উল্লাস তুঙ্গে । সকালে একরাশ ঘোর নিয়ে যে যার মতো । সেই রেশ উনি শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন । এক চৈত্রের শেষ দিনে উনি কবি সম্মেলন আয়োজন করলেন । ন'জন কবির নীলাগ্নিরসোল্লাস । অনেকের সঙ্গে আমাকেও ডাকলেন আয়োজনে । একটি বর্ণ না লেখা সত্ত্বেও সেই ডাকে ভিড়ে যাওয়ায় কে যেন বলল, আমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে । শুনে আমোদ পেলেন । এক অপরিচিতর সেই স্বীকৃতিটুকু ওঁকে তৃপ্ত করেছিল । জানছি, নাস্তির একমাত্র অবলম্বন অস্তি । শতবর্ষ পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষ হওয়ার ডাক তাতিয়ে দিচ্ছে । ধর্মের বিদেহী আশ্রয় ছেড়ে দৃশ্যমান মূর্তির দিকে লেগে থাকা মানুষের ঘোর নিয়ে মেতে উঠছে সে-সমস্ত দিন-রাত । তিন জন, তমলুকে বর্গভীমা মন্দির দর্শনে যাওয়া হল । একরাতের ছোট্ট ট্রিপ, প্রচুর আনন্দ নিয়ে ফিরলাম । পরে আবার গেছি । রূপনারায়ণ নিত্যনতুন ছবি দিয়েছে ।

প্রথম বার তারকেশ্বর গিয়ে সব কিছু সুন্দর হওয়ার পরও শিবের সাক্ষাৎ হয়নি । যাওয়ার পথে কোথাও সন্ধের ঝোঁকে এক মন্দিরে একা শিবকে পেয়ে যাই । দুজনে মহানন্দে এক কলসি করে গঙ্গাজল তাঁর মাথায় ঢেলে দিই । বাঁক ফেলে একটা করে কলসি নিয়ে বাসে তারকেশ্বর পৌঁছই । মাত্র একটা কলসি নিয়ে পুরোটা না হেঁটে যাওয়ায় বোধ হয় কোথাও সত্যের খামতি ছিল । দেবরোষে, মতান্তরে ছিটিয়ালির ফলস্বরূপ সে-রাতে প্রচুর মশার আক্রমণ সহ্য করতে হয় । তবে পরের বার দোলের দিন তিনি ব্যাপক হুল্লোড়ে দুজনকে চুবিয়ে দিয়েছিলেন । মন্ত্রপাঠের পর পুরোহিতের হাতে দক্ষিণা দিয়ে আবির মাখিয়ে দু'দিক থেকে কচলে দেওয়ায় হৈ হৈ, দেবস্থান আমোদে ভরে গেল । স্বয়ম্ভূ খুশি মনে বেলপাতা দিলেন, গর্ভগৃহের বাইরে এসে ভাগ করে খেয়ে নিলাম । খুচরো ঈশ্বরসঙ্গ ফুর্তির বাজারে তখন জোয়ার এনেছে । সেই টানে মড়া বাসি ফুল গুয়ের ডেলা, অনেক পতিত ভেসে যাচ্ছে । শিক্ষা সংক্রান্ত অফিসটা তাঁর কবিমনে চাপা অস্বস্তি তৈরি করছে । বাড়ির কাছে হওয়ায় রোজের যাতায়াত সামলে নিলেও মানানোর সমস্যা ছিল । যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন । দেহ-মনের জোর বাড়াতে রবিবারের সকালে এল বিশেষ চর্চা । কখনও উনি কলেজ স্ট্রিট বাজারে, কোনও দিন আমরা হাতিবাগান বাজার থেকে শ্বেত শিমূলের মূল সংগ্রহ করে একত্র হয়ে ভাগাভাগি হিসেবে খেয়ে নিতাম । অল্প জল পানের কিছুক্ষণ পর খাওয়া হত মাংসের সিঙাড়া । সূর্য সকল শক্তির উৎস মেনে গ্রহশান্তির সঙ্গে মিশে যেত দেশি চক্কর ।

বাংলার পড়ুয়া মহলে বেশ জনপ্রিয় কামুর দ্য আউটসাইডার। সেই লেখায় এক চরিত্র আছে, যার সঙ্গী একটি লোমওঠা ক্ষীণজীবী ঘ্যানঘ্যানে কুকুর। লোকটি তার পোষ্যকে নিয়ে নিয়মিত হাঁটতে বেরোয় আর নাগাড়ে নোংরা ছ্যাঁচড়া বদমায়েশ বলে তাকে শাসায়। পোষ্যটি যখন পেচ্ছাপ করার জন্য দাঁড়াতে চায়, লোকটি তাকে চেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। সে করুণ চোখে তাকায়, পথে ফোঁটা ফোঁটা জলের দাগ পড়ে। সেই পোষ্য একদিন মনিবকে একা রেখে চলে যায়। অসহায় লোকটি অন্যের কাছে আশ্বাস খোঁজে, কুকুরটা নিশ্চয় ফেরত আসবে এই আশায়। ওই বিরক্তিকর প্রাণীটা চলে যাওয়ায় যেখানে লোকটার স্বস্তি পাওয়ার কথা ছিল, সেখানে ঘটনাটা তাকে সঙ্গিহীন একাকিত্বর সামনে দাঁড় করায়।
তেমন কিছুই নয়, পার্থপ্রতিমের কম-বেশি পাঁচ দশকের কবিজীবন যদি গল্পের সেই লোকটা হয়, তবে কুকুরটা হল মাঝখানে প্রায় তিরিশ বছরের চাকরিকাল। এখানে এক কবি ঘ্যানঘ্যানে বিরক্তিকর চাকরিটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছেন। যিনি জানেন, বার্ধক্যে ওই গল্পের মতোই কয়েক ফোঁটা জলের দাগ ফেলে চাকরিটা তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। ফিরবে না, নিশ্চিত। যেটা গল্পের চরিত্রটা জানত না বলে অন্যের কাছে ভরসা খুঁজছিল, কবি সেটা জানেন। তখন অখণ্ড অবসর কতটা লিখতে সাহায্য করবে কে জানে। যে সময় তাঁকে চাকরিটা নিতে বাধ্য করেছে, সেই সময়ের দাবি পূরণ হলে নিঃসঙ্গ জীবন অবধারিত। আগামী তাঁকে সেই খোপে ভরতে চায়। সেটুকু বুঝেই জীবনের ঠিক মাঝামাঝি এসে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কবি তো, হয় লোরকার মতো কিছু মূর্খের হাতে খুন হতে হবে, নয়তো জীবনানন্দের পথে শিক্ষিত নাগরিকদের হাত থেকে বাঁচতে ট্রামের তলায় আশ্রয় খুঁজতে হবে। মানুষের স্বীকৃত এই গতিপথ কাউকে চিন্তায় ফেলতেই পারে, তবে সকলকে নয়, সেটাই বাঁচোয়া।

এক রবিবার কোনও অনুষ্ঠানে অমন্ত্রণ পেয়েছেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি জানালেন, যেতে হবে, দেখা যাক। নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় একটু দেরিতে গঙ্গাপাড়ের ঠেকে হাজির। কী হল! কী আর, হলের আলো-আঁধারি পরিবেশে সংস্কৃতির ফাঁকে কে বা কারা নাকি দুর্বৃত্তের মতো বাতকম্মো চালাচ্ছিল। ওখানে টেকা অসম্ভব। ঠেকদাররা আমোদিত। কথা প্রসঙ্গে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ওঠা এক অমোঘ প্রশ্নের সমাধান মিলল। আশির দশকেও যারা আলো নিভিয়ে বায়ু বিষিয়ে চলেছে, তাদের ক্ষমা করা বা ভালোবেসে ওঠা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। যদিও সিদ্ধান্তটা সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। এর পর প্রেতকুলের গন্ধবিলাস নিয়ে আড্ডা গড়াল রাতের দিকে। সেখানে মরচের প্রাধান্য দু-একজনকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। তখন নন্দন পত্তন হয়েছে। হুজুগে পড়ে হাওয়া দেখতে গেছি। সুসজ্জিত কালচারাল জোনে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু বুনুয়েলবিদ বুনো আঁতেল। প্রত্যেকেই বিভোর। সংস্কৃতির লাবণ্য মাখা। লক্ষণীয়, লা-টা ফরাসি। এদের দিয়ে নবতরঙ্গ দূরস্থান, ডোবার মতো থুতুর আয়োজন সম্ভব কি না সেদিন সন্দেহ হল। বাধ্যত ঘোর কাটাতে বারদুয়ারি।
অত কিছুর পর জানা গেল, শিক্ষার দফতরটি লাটে নয়, উঠে যাবে সল্ট লেক অঞ্চলে। মানিকতলা থেকে নিয়মিত যাতায়াতের সমস্যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। সরকারি চাকুরে হিসেবে দামি মাছ জুতো টি-শার্ট সিগারেট বা দূর-ভ্রমণের প্রত্যাশী না হলেও বয়সের সঙ্গে খরচ বাড়ছে। একদিন সরাসরি বললাম, চাকরির ফাঁকেই তো লেখালেখি করছেন। পার্ট টাইম লেখক। খুব কিছু অসুবিধের নেই তো। ষাট-সত্তরের সাম্যবাদে বিশ্বাসী মানুষ। আশিতে নিশ্চিত, ক্ষমতা ও রাজনীতি একে অন্যের কাজে লাগলেও চলনে সমান্তরাল। হিন্দি চলচ্চিত্র সূত্রে সেক্স আর ভায়োলেন্সের মতো। মতবাদ বা বিশ্বাস তখন গৌণ। সাম্যর ঘর

দখল করেছে বৈষম্য । নিজে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরে । যারা প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছে । এই ষড়যন্ত্রের সামনে তিনি অসহায় । ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পিছিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কোনও অজুহাত তাঁকে শান্তি দেয়নি । অথচ কথা ছিল, শুয়োরের খোঁয়াড়টা সাফ করার । অদক্ষ লোকজন তা না করে মাগনায় পাওয়া বিষ্ঠাকুণ্ডের লোভে হামলে পড়ল । তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম, সে পুঁজি বাড়ল । সঙ্গে মূর্খের সম্পদ আস্ফালন । মাছি যেমন গুড় আর গুয়ের তফাত মানে না, ঠিক তেমনই সর্বহারার শর্ত অস্বীকার করে কিছু চোর ভিখিরি দালাল ক্ষমতার বৃত্তে লেপটে গেল । অপার জ্ঞান অটুট ভক্তি সহযোগে অদম্য কর্মবীররা বাংলা দাপাচ্ছে । কংগ্রেসি কালচারের চেনা ছবি থেকেই বাংলার বামেরা তখন মূর্ত হচ্ছে । আর কংগ্রেসকে সমানে দোষারোপ করে চলেছে । মানুষ দেখছে, মাপছে, নেতা ধুতি কাচছে । রাজনীতি কই? সে নাকি সযত্নে ল্যাংটের বুকপকেটে গোছানো আছে। প্রায় দু-দশক পর বিনাশকালে স্পষ্ট হল, বামেদের বিপ্লবী সত্তাটা উধাও । সর্বহারা বদলে আমরা-ওরা, পরিণতিটা সম্পূর্ণ হল নিদারুণ ঠোক্করে ।

এই সঙ্কটকালে ছাপার অক্ষরে মিলল টেবিল দূরের সন্ধ্যা । আজ ঠিক মনে পড়ে না, পার্থদা তখন সল্ট লেকের অফিসে কি না । কয়েকটা লাইন ফের জানান দিল, পার্ট বা ফুল নয়, কবি সময়টা ধরতে পারে । কেরানির দ্বিধাটুকু তাতে রস সঞ্চার করলে ক্ষতি কী । নেহাত কেজো জিনিসের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলার অস্বস্তি, তাকে বয়ে চলার ঝক্কি তা হলে কবিতা হয়ে ওঠে! কেরানির একঘেয়ে যাপন, সকালে বাজার দুপুরে অফিস সন্ধ্যায় আড্ডা সেরে বাড়ি । ফের কাল, আবার । নিজেকে ভাগ্যবান মনে হত । উনিও মানতেন । কলকাতা ও আশপাশের জেলায় জ্যোতিষের সুলুক সন্ধান রাখতেন । কয়েকজনের কাছে ওনার সঙ্গে গেছি । কিছু কথার পর বোঝা যেত, চর্চায় তারা কিছুটা পিছিয়ে । কারও তান্ত্রিক সেট আপ কেউ বিপ্লবের ক্ষণ নির্ণয়ে ব্যস্ত, অনেকে হাসিখুশি নংফংলাওয়ের ঠেকা নিয়েছে । কেজো ফলের আশা না করেই সেসব ভাগ্য বিচার চলত । উড়তে উড়তে ডানা ভারী লাগছে, সো রিল্যাক্স পায়রা রিল্যাক্স । মাঝরাতে ইনামিনাডিকা কাগজের ফুল মনে হলে দরজা ভেজিয়ে বারান্দার বাঁ-প্রান্তে তেরপল ঘেরা চৌকিতে পুণ্যাশ্রয় । বারান্দার কোণে আধ বালতি জল আর একটা মগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পুণ্যর বুকে ঘাম মাথায় ঝুঁটি পিঠে গাঁজার গন্ধ । কোমরে ট্যানা স্পর্শের অপেক্ষায় । ঘুমোসনি, ব্যস । উনি জানতেন, কখনও উৎসাহ দেখাননি প্রশ্রয় দেননি নিষেধ করেননি । ভালোবাসার মানুষ আর মানুষের ভালোবাসা, দুটোতেই শ্রদ্ধা ছিল অনুকরণীয়।

অষ্টআশি-উননব্বই থেকে নানা ছকে পড়ে আড্ডা অনিয়মিত । সাক্ষাৎ হলে কথা ফুরোয় না । সেবার বইমেলায় ফরাসি বিপ্লবের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে সাজানো স্টলে সৈন্য ও সারসের এক আশ্চর্য ছবি দেখে কয়েকজন অত্যন্ত আমোদ পেয়েছিলাম । বিরানব্বইয়ের কালীপুজোর রাতে ওনার নতুন আস্তানা সল্ট লেকের দোতলার ফ্ল্যাটে রাতভর রাঁধা-খাওয়া । দুজনের শেষ রাত্রি যাপন । তখন নানা ছকে লোকের আব্দার মেটাতে দিন যায় । মওকা মতো দেখা-সাক্ষাৎ । উনি সপরিবার লবন হ্রদের বাসিন্দা । গেলে সকলেই আনন্দ পেতেন । আসত ঘোষ লেনের খণ্ডস্মৃতি । বিভিন্ন খাবার । একবার লিখলেন, ‘ বিগতের এই অরণ্যে একা ঘুরছি আমি ।’ কী ব্যাপার! সল্ট লেকের বাসিন্দারা অনেকেই মানুষ সেজে ঘুরছে । খুব একটা বিশ্বস্ত নয় । ‘আছি বাম বিধাতার বশে ।’ এতদিন পর? এখানে থাকতে গেলে না মেনে উপায় নেই । এল নতুন শতক, সহস্রাব্দ। সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের প্রতি কৃতজ্ঞ । অবসর এগিয়ে আসছে । লবন হ্রদ থেকে বেরনো যাবে, আশাবাদী ।

সিঁথির ফ্ল্যাটে শেষ কয়েকটা বছর সপরিবার অসুখে জর্জরিত । একমাত্র সন্তান বিদেশে ব্যস্ত । সময়ের দাবি মেনে বাঙালির একক যাপন । যা ছিল না, সেই চাপা ক্ষোভ অস্থিরতা বশ করছে । ভরসা জোগানোর যোগ্যতা কোনও দিন ছিল না, তবু মনে করিয়েছিলাম, আপনিই তো মেনেছিলেন, কর দো জি ঘায়েল তুমহারা হ্যায় জমানা । মানলেন, কাদায় চাকা বসে যাওয়ার সম্ভাবনা আর বসে গিয়ে ঝাড় খাওয়ায় তফাত অনেক । এযাবৎ প্রতিটা মুহূর্ত ভবিষ্যতের ভেক ধরে অতীতের গ্রাসে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, মারাত্মক রিস্কি । ‘শ্বেতপাথরের গোলাপগুচ্ছ’ দিলেন, দু’জনকে । আগের মতো সেটাও বেহাত । ওনার হাতে লেখা আমার নাম কাছে নেই । আছে কোথাও । সিঁথি থেকে মাঝেমাঝে সকালে ঘুমভাঙানো ফোনটা আসত । ঘুমের ঘোরে ভুলভাল বললে আবার ঘুম ভাঙিয়ে ঠিক করে দিতেন । আর নয় । গত ভূত চতুর্দশী রাতে ওনার ইচ্ছায় আটাপাড়ার প্রাচীন কালীমন্দির দর্শন । সেখানে এক অপূর্ব মূর্তির পরিচয় জানি না শুনে অস্থির । বাড়ির কাছে তো, শরীর দিলে একবার যাব । লক ডাউন পর্বে সাবধান করতেন । এক সকালে জানতে চাইলেন, একমাত্র প্রিয় হিন্দি গান কী । একটা, দোটানায় একটু বিরক্ত । বললাম, নিজেরটাও বললেন । কথা আলাদা, কণ্ঠ এক, মেজাজে ফুর্তি ।



পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল - বাংলা কবিতার রক পাখি

অর্ক দেব

বাংলা কবিতায় প্রাগাধুনিক যুগ থেকেই অনেকগুলি ধারা একই সঙ্গে খেলা করছে । এর মধ্যে দেবীর অভিপ্রায়ে লিখনের একটি স্রোত সুস্পষ্ট ছিল প্রথম থেকেই । আমি ভক্তিমূলক আবেশাচ্ছন্ন পদাবলীগুলি বা অন্য কোনও প্রত্যক্ষ পয়ারলিখনের কথাই বলছি না, বলছি এক ধরনের দৈব তাড়নার বশে লিখনের কথা । সেই যখন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে লিখছেন, "অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে । পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে । ।সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী । ত্বরায় আনিল নৌকা বামস্বর শুনি"। (অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা), সেই ক্ষণ থেকেই যেন এই স্বর শুনতে পারা যায় । ক্রমে এই নদী ক্ষীণকোটি হয়েছে, তবে ফসফরাস জ্বলে উঠেছে বারবার । বিশেষত মধুসূদন যখন লেখেন-

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ।

সাধিতে মনের সাদ,

ঘটে যদি পরমাদ,

মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে ।

প্রবাসে, দৈবের বশে,

জীব-তারা যদি খসে

এ দেহ-আকাশ হতে,– নাহি খেদ তাহে ।

জন্মিলে মরিতে হবে,

অমর কে কোথা কবে,

চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?

কিন্তু যদি রাখ মনে,

নাহি, মা, ডরি শমনে;

মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

সেই ধন্য নরকুলে,

লোকে যারে নাহি ভুলে,

মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন –

কিন্তু কোন্‌গুণ আছে,

যাচিব যে তব কাছে,

হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!

তবে যদি দয়া কর,

ভুল দোষ, গুণ ধর,

অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!–

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,

মানসে, মা, যথা ফলে

মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে হয়, মনে হয় কবি আত্মাকে উপড়ে ফেলছেন । আপনি বৈষ্ণব সাহিত্য রসের নানা মাধুর্য দেখতে পাবেন, ভক্তির ফল্গুধারা দেখতে পাবেন, কিন্তু এই লিখন স্রেফ ভক্তির চ্ছটা আর মাহাত্ম্যবর্ণনই নেই, রয়েছে এক ধরনের ঘোর । কবির দিব্যোন্মাদ দশাটি প্রকট, লিখতে হচ্ছে - অভিপ্রায়জাত অকালবোধন । এই প্রসঙ্গে আরও একটি কবিতার কথা মাথায় আসছে, নজরুল ইসলামের লেখা 'আনন্দময়ীর আগমনে' । লেখাটি যেন সংকল্পস্বরূপ, তার কিছু নিশ্চিত নিয়তি রয়েছে । এভাবেই আসছে কৃষ্ণা দ্বাদশীর জোৎস্নায় মৃত চরে বেহুলার ভেলা ভাসানো সেই ছবিটিও, রূপসী বাংলার ক্যানভাসে জীবনানন্দ

যা এঁকেছিলেন । আমি এই ধারাটির শেষ মুসাবিদা পড়েছি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের কবিতায় । আমি বিশ্বাস করি, উপরে যে চোরাস্রোতটির কথা লিখেছি, তারই বিষে নীল হয়ে বাংলায় কবিতা করতে এসেছিলেন প্রয়াত কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল । তিনি 'পিশাচসিদ্ধ', 'প্রেতলোকের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্কে বাঁধা', চারপাশে ঘুরতে থাকা এই সব অহৈতুকির চেয়ে আমার কাছে এই নিজস্ব যুক্তিটি অনেক বড় । নানা ইশারায় বারবার এই অদৃষ্ট এবং সংকল্পের কামড় টের পাই, কারণ তিনি বলেন প্রকাশিত হওয়ার বাসনা নয়, অন্য নানা দুরাভিসন্ধি নিয়েই তিনি মুদ্রিত হন । আমার কাছে তাঁর পাঠকের সঙ্গে দেখা করার টেকনিকটি স্বর্গীয় আপেলের মতো ।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । আমরা দেখতে পাই যুগচিহ্ন অর্থাৎ বামপন্থী ইউটোপিয়া এবং হাংরি ডিসটোপিয়া এই দুই ত্রাহ্যস্পর্শ পেরিয়ে লেখায় এক নতুন তথা আদিম নিখিলভঙ্গিমাটি নিয়ে এসেছিলেন । কিন্তু এখানেই প্রশ্ন শুরু হয় নিজের সঙ্গে নিজের । যে পার্থপ্রতিম জীবনানন্দ দাশ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণয়ভূক, তাঁকে সত্তরের ঝোড়ো সময় স্পর্শ করেনি ? কবিতার সনাতন ছাত্র শিক্ষকরা এ বিষয়ে কী মনে করেন জানি না, আদৌ কিছু মনে করেন কিনা তাও জানি না, সম্ভবত কবিতার জমিদারি সিলেবাসে এসব কখনওই ঠাঁই পায় না । তবে আমার মনে হয় ওই ঘোর অমানিশার সঙ্কেতই তাঁকে এই লেখায় এনেছিল । নন্দীগ্রাম-সময়ে তাঁর চলাচল যাঁরা জানেন বা আমার মতো লোকমুখে শুনেছেন অন্তত তাঁরা বুঝতে পারবেন আমি কোন ভূমিকার কথা বলছি ।   থিসিসের পরিবর্তে অ্যান্টথিসিস তিনি লেখেননি, বিরোধ অথবা মিলনের লাশকাটা ঘরে কোনও দলে না ভিড়ে তিনি এক পৃথক শক্তির উৎস সন্ধানে হাঁটছিলেন যেন । অন্ধকার সময়ে তাঁর লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'দেবী' । প্রিয়তম বন্ধু অমিতাভ গুপ্তের প্রথম বই 'আলো'-র বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রস্তুত হয়েছিল এই বই ।

পার্থপ্রতিমকে একটি বহমানতার অংশ বলছি ভেবেচিন্তে, এলিয়টের Tradition and the Individual Talent প্রবন্ধসূত্রে । এলিয়ট এই প্রবন্ধে দেখিয়েছে কোনও কবিই একক নন, তাঁর সত্তা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি পূর্বজ তথা মৃত কবি-শিল্পীদের পারম্পর্যের কারণেই । কিন্তু অতীতকে তিনি ঘা-এর মত বহন করবেন না, এক বা একাধিক অনুপ্রেরণা তাড়িত হয়ে তিনি নকল কাব্যবিধায় তৈরি করবেন না, একটি বিশেষ সময়তলে নিজেকে জোর করে বসিয়ে দেবেন না তিনি ।

"To proceed to a more intelligible exposition of the relation of the poet to the past: he can neither take the past as a lump, an indiscriminate bolus, nor can he form himself wholly on one or two private admirations, nor can he form himself wholly upon one preferred period. The first course is inadmissible, the second is an important experience of youth, and the third is a pleasant and highly desirable supplement."

পার্থপ্রতিমের অভিপ্রায় এমনই । তিনি দশকওয়ারি মেষবৃত্তির ধার না ধরে একটি স্বতন্ত্র কাব্যরুচিকে জল-সার দিয়ে তৈরি করেছিলেন । 'দেবী' কাব্যগ্রন্থটি এলিয়টের যুক্তির নিরিখে উল্টেপাল্টে দেখছি, তা একশরীরী কিন্তু একক কোনও ছায়াছন্নতায় দুষ্ট নয় । বন্দনা বিলাপধ্বনি অংশটি পড়লেই স্পষ্ট হয়, রণ-রক্ত-সফলতার রোজনামচায় তাকে বসানো যাচ্ছে না, কালের সীমা ভেঙে এক মহানির্মিতির প্রচেষ্টাই চোখে পড়ছে । পার্থপ্রতিম লিখছেন-

যেমন সম্পর্কে আমরা অনভিজ্ঞ, তেমনই রয়েছি আয়ুভাগে । শিশু ভুলে যায়
তার মুগ্ধতাই আমাদের গ্লানি থেকে উদ্ধার করে পুনর্মুগ্ধ করে,
কিশোর ভুলেছে তার ব্রীড়ানত উৎসাহের রেখা আজো কালজয়ী,
যৌবন ভুলেছে তার মধুর ভঙ্গিমা আজো প্রকৃতির কোনো ঐশ্বর্যই
আয়ত্ত করেনি,
প্রৌঢ়তা ভুলেছে তার প্রসন্নতা
শীতের রৌদ্রের থেকে আরো বেশি প্রার্থিত এই পৃথিবীতে ।
আমরা কেবল
ক্ষমতা ও বোধের অভাবে শিশু,
সীমাজ্ঞানহীনতার জন্যই আমরা কিশোর
ভ্রান্ত মত্ততা ছাড়া আমাদের যৌবনের অন্য কোনো অভিজ্ঞান নেই
কুটিলতাপ্রিয় বলে আমরা প্রত্যেকে প্রৌঢ় স্বেচ্ছানির্বাসনে
কণ্ডুয়নসুখে ।
মানুষের ব্যবহারে আজো রঙ্গ আছে, চৈতন্যে রহস্য আছে– পাশাপাশি
এইসব থেকে গেছে, বড় দীর্ঘযাত্রার পর ক্বচিৎ রুপোলি রেখা
দৈন্য আরো ঘনীভূত করে ।
কোন বেদীমূলে
তোমার উৎসবের জন্য সংগ্রহ করব উপচার, সমিধ জ্বালাবো
কয়েকটি বিরলকণ্ঠের নান্দীপাঠ ডুবে যায় অসুরনিনাদে
এরা প্রত্যেকেই সেই মুদ্রারাক্ষসের আর মহিষাসুরের সহচর, এরা দুর্যোধন ।

তোমার ও রক্তবর্ণ আনন ফেরাও, হে দারুণ, তুমি খড়্গ তোলো
অস্ত্র উপচারে তুমি পূজা করো এই রোগগ্রস্ত মানুষের

এই অংশটি পড়ে কত যে ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনে, সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে, “যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা; / যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই–প্রীতি নেই–করুণার আলোড়ন নেই/ পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া " ।

আমার বলার বিষয় হল, নকশালবাড়ির মায়েরা যখন অস্ত্র তুলে নিয়ে জোতদারদের বিরুদ্ধে দ্রোহ রচনা করছে, সেই সময়েই তো লিখতে আসছেন পার্থ । তাঁর মনের বীজতলায় এক দেবীর আবির্ভাবের সংকল্প জন্ম নিচ্ছে কেন? সাদাকালো রাজনীতি নয়, অন্য কোনও নীতির জন্ম দিতে চাইছেন তিনি, যা ধর্ম-সজ্ঘ-নির্বাণের পথ হলেও হতে পারে । তাই লিখছেন, "তোমার ও রক্তবর্ণ আনন ফেরাও, হে দারুণ, তুমি খড়্গ তোলো অস্ত্র উপচারে তুমি পূজা করো এই রোগগ্রস্ত মানুষের" ।

এই ডাক কোনও সনাতনী হিন্দু অভিলাষ নয় । ঠিক যেমন আজকের ধ্বস্ত সময়ে ফিরে ফিরে আসছে জীবনানন্দের দাগিয়ে দেওয়া মানুষগুলি-পৃথিবী অচল আজ তাঁদের সুপরামর্শ ছাড়া, তেমনই এই আলোর উপাচার ।

সত্তর দশকে হিন্দি সিনেমার কল্যাণেই সম্ভবত হিট-ফ্লপ এই শব্দগুলিও বাংলা কবিতার বাজারে ঢুকে গিয়েছিল । বাজারের বিশেষণে তাই এই বইয়ের গায়ে পড়বে ফ্লপ শিলমোহর । কিন্তু পার্থপ্রতিম তাঁর ফ্লপ বইটির অভিঘাত নিয়ে একটি 'হিট' যুক্তি দিয়েছিলেন রণজিৎ দাশকে । কবি বা কবিতার এর চেয়ে বড় খাঁড়ার ঘা আর হয় বলে জানি না । পার্থপ্রতিম বলেন, এক শ্রমিক যুবক নাকি আত্মহননের পথ বেছে নেন বিয়ের ঠিক আগে , তার বালিশের তলায় ছিল দেবী কাব্যগ্রন্থটি । কেন ছিল? কেন তাঁর মরিবার সাধ হল? পার্থপ্রতিম এই অকল্পনীয় অভিঘাতকেই স্বাভাবিকতা মানেন । আর পার্থপ্রতিমের এই মনোজগতের তল পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । কারণ সেই বিশ্বাসের তলটি আলাদা, পার্থপ্রতিম অন্য এক জ্ঞানপৃথিবীর (নলেজ আর্কেটাইপ) বাসিন্দা, সেখানে আমাদের যাতায়াত নেই, হয়তো ছিল পিতামহ-পিতামহীর ।

টেলিভাইজড কবিতার যুগে, গান আর কবিতার ধূসর আল মুছে যাওয়ার সময়ে রোজ রোজ প্রকাশিত হওয়ার আর্তির মধ্যে পার্থপ্রতিমের চলাচলকে ধরতে অরগ্যাজমের আনন্দ হয় । তাঁর কবিতাগ্রন্থের সংখ্যা হাতেগোনা । ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে কৃশকায় 'দেবী' গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ নাকি তেমন সফল হয়নি তাঁর স্নাতক হওয়ার অভিপ্রায়টি বড় হয়ে যাওয়ায় । ১৯৮৩-তে 'রাত্রি চতুর্দশী' এবং ১৯৮৪ সালে 'টেবিল, দূরের সন্ধ্যা' নামের দু'টি এক ফর্মার কবিতাপুস্তিকা প্রকাশিত হয় । সাকুল্যে এই তিনটিই ছিল পাঠকের সম্বল । ষোলো বছর পর আসবে 'পাঠকের সঙ্গে, ব্যক্তিগত' । আবার বারো বছর পর 'বর্ণজীবের সনেট' এবং তার দু'বছর পর 'শাদা পাথরের গোলাপগুচ্ছ' । এই যে নানা কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদের মতো বিরতি, এইটাও পার্থপ্রতিমের কাব্যরুচির বৈশিষ্ট্য । অজস্র অগ্রন্থিত কবি গ্রন্থিত কবিতা রয়ে গেল তাঁর, যা প্রকাশিত হয়েছিল তা কিন্তু ওই ছাঁচে ঢালা এক ধারসে মেরে দেওয়া কালানুক্রমিক ব্যাপার নয়, সবটাই তাঁর নিজস্ব যুক্তির পরিখানির্মাণ । এরিকা জং বা ভিক্টর হুগোর মতোই তাঁর নানা উদ্ভট শর্তাশর্ত নিয়ে লিখতে বসা । কোনও লেখা তাঁর কাছে নগ্নতা দাবি করে, কোনও লেখা নানাবিধ নেশা । পার্থপ্রতিম বাঙালি কবির সুশীল সুললিত ছবিটার মুখে কালাধাব্বা, কারণ মদ খেয়ে তিনি উদাত্ত গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে ওঠেননি । নেশা করে তাঁর নাচাগানা করতে ইচ্ছে করেছে, অকপট বলেছেন সে কথা । তাঁর কবিতায় উঠে আসে উষা উত্থুপের গানের বাণী-আউয়া আউয়া, সনেটের শক্তিতে তিনি বিশ্বচরাচরে নানা পরিবর্তনসাধনের কথা ভেবে গিয়েছেন, হেঁয়ালির চেয়েও অনেক দুর্বোধ্য তাঁর মানসচরাচর । নিও রোমান্টিকদের নকলনবিশী আর আধুনিকতার ক্লান্ত প্রাণের স্বর্গ-

স্যারিডন-সুপর্ণা কাঁদুনি কাটিয়ে তিনি কবিতায় নতুন-নিজস্ব বিষয় নিয়ে এলেন, থেকে গেলেন । আঙ্গিককে আঁকড়ে থেকে তিনি নানা সড়কে ঘুরে বেড়ালেন একাকী বাঘের বিক্রমে । ঘুরে ঘুরে পড়ি-

যশোর, 'সবুজ ট্রেন, তুমি কি এখন

অন্য কোনো বালকের মর্মে এসে পড়ো?'

সেখান থেকেই মন ইন্টারকাটে চলে যায় 'বালককালের প্রথম বেশ্যা' কবিতাটিতে, কী অবিস্মরণীয় ইমেজারি । কোটেশান জর্জর পার্থপ্রতিম সামারি লিখতে চাইছি না । পার্থপ্রতিমকে পড়ার সূত্রগুলি স্মরণ করতে চাইছি শুধু, রামঠাকুরের মৃত্যুদৃশ্য- যেভাবে তিনি নির্মাণ করেন, সেসব পড়ার পরে সারহীন অন্ত্যমিলের পারম্পর্যহীন (এলিয়ট যাকে কবিতা বলেই মানেন না ।) কাব্যগুলি পড়তে ইচ্ছে করে না ।

পার্থপ্রতিম কবিতা লেখার জন্য পুরস্কার দেওয়া নেওয়াকে জঘন্য অপরাধ বলেই বিবেচনা করেন, কিন্তু জীবন উপান্তে তাঁকে একটি দু'টি পুরস্কার নিতে দেখতে পাই । দেখতে পাই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হতে । জানি না কার প্ররোচনায়, কেন, যদি ধরে নিই নিজেরই মুদ্রাদোষে, তবে একটা প্রশ্ন জাগে, তিনি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে না বিপক্ষে?

ওঁর অবাধ কারবার নাকি লোকের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে, পার্থপ্রতিম জন্মনিন্দুক, প্রকাশ্যেই

তিনি নানা অনিষ্টচিন্তার কথা বলেছেন, একটি অন্য মনলোকের ইশারা দেখতে পাচ্ছি এসবে বারবার । এসব দেখেশুনে সর্বোপরি প্রকাশিত হওয়ার রাজনীতিটা দূর থেকে দেখে ছক সাজাতে বসে মনে হয় পার্থপ্রতিম প্রতিষ্ঠানপন্থী বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী কিছুই ছিলেন না, লিখনে-মননে তিনি প্রতিষ্ঠান-বিমুখ ছিলেন,দূরত্ব নির্মাণ করে নিজের কবিতাকেই বাঁচিয়ে দিয়েছেন । বাংলা কবিতা এমন একটি চুম্বককে হারাল, যদিও এখানেই শুরু চাকতির খেল, বাংলা কবিতার যদি একজন সৎপাঠক থাকেন, তবে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের কবিতা পড়তে হবে । পড়তে হবে-

" টেবিল, দূরের সন্ধ্যা

ঘনিয়ে আসছে । ফল, মৃতদেহ

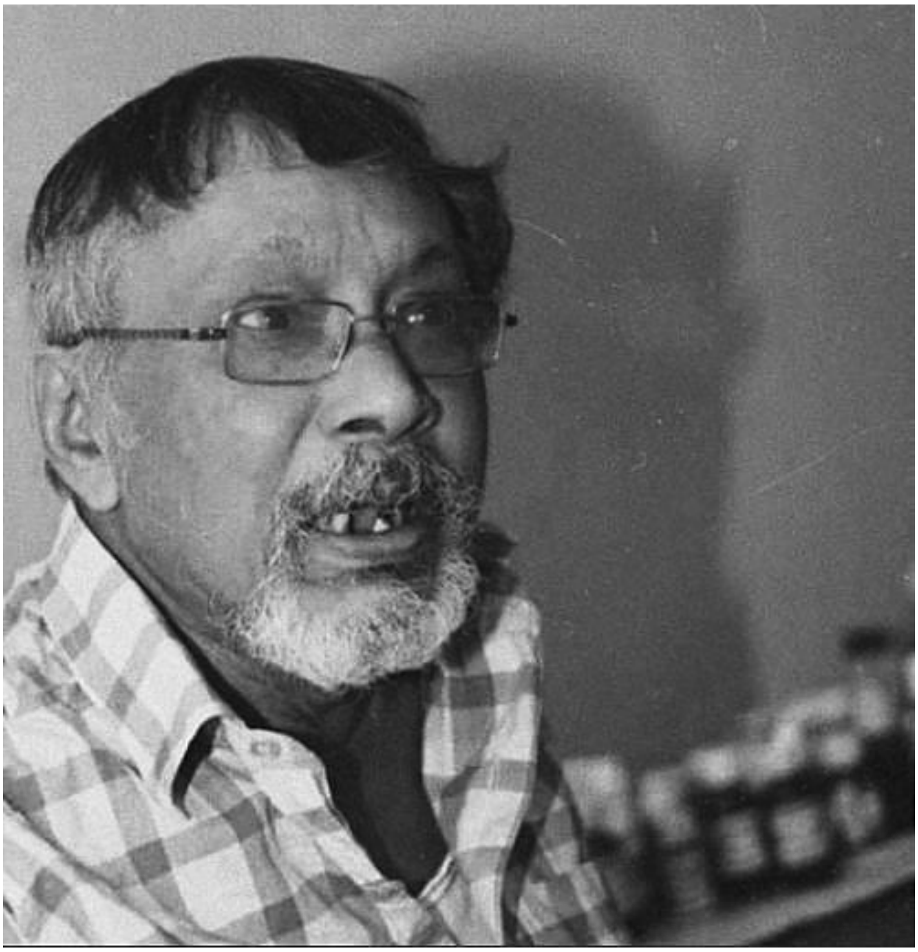
অফিসফাইল, জোড়া-খোয়া দুল

নেগেটিভ প্রিন্ট, অ্যালবাম, প্যাড

কি রাখবো তোমার উপর?

চেয়ার, রাখতে হবে সামান্য সরিয়ে!"

বাংলা কবিতায় স্পেসের ব্যবহারে রকপাখির মতো বিকেল ভেঙে সন্ধ্যা আসতে দেখেছি আমি এই একবার, একবারই ।



পার্থপ্রতিমের সঙ্গে, ব্যক্তিগত

সেলিম মল্লিক

" 'মানুষ' , এ শব্দটি/ ছিলো 'কবিতা' র দয়িত " এবং " 'কবি' – এ শব্দটিতে আজকাল/ গুরুত্ব নেই আর"– 'বহিরাগত' কবিতার বইটি শেষ কবিতায় গিয়ে এরকম একটি খেদ উগরোতে উগরোতে সমাপ্ত হবে । কবি শব্দটির গুরুত্ব বাড়ুক-না-বাড়ুক, কবিতাকে মানুষের দয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, তাঁর 'বহিরাগত' গ্রন্থিকায় । দিতে চেয়েছেন না, বলা উচিত এ-ই তাঁর প্রত্যয় । তাঁর কাছে কবিতা কোনো শিল্প বা সাহিত্যের আঙ্গিক নয় । কবিতা তাঁর কাছে নির্দেশ । নির্দেশ কার? নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না, অনুমান করি– অদৃষ্টের । নির্দেশ মান্য করতে তিনি এতদূর সংকল্পে স্থির যে, যদি একটি কবিতা রচনার দাবি এমন হয়, পোশাক ছেড়ে লিখতে যেতে হবে, তবে তিনি নগ্নতাকেই অবলম্বন করবেন । কবিতার জনয়িতা হিসেবে তিনি এইরকম অতিলৌকিক । 'বহিরাগত' পড়ে তাঁর এতদিনের পাঠক খানিক অবাক হয়েছেন এই ভেবে, যে-পার্থপ্রতিম কবিতার উপাদানে প্রকরণে কঠোরভাবে ধ্রুপদি, তিনি কী করে সমসাময়িক রাজনীতির দ্বারা আলোড়িত হয়ে এমন একটি কবিতার পুস্তিকা লিখে ফেললেন, 'ধর্মপুত্র, এখানে আসুন' -এর পর, আবারও । এই সূত্রেই তাঁর কাব্যিক প্রত্যয়কে অনুধাবনের প্রশ্নে আন্তরিকভাবে বিবেচনা করবার গভীর প্রয়োজন আছে । এই বিবেচনার ভেতর দিয়ে হয়তো উত্তর

মিলতে পারে, কবি শব্দটিতে আজকাল গুরুত্ব নেই কেন? কেন আর মানুষের দয়িতা নয় কবিতা? পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল যেন মানুষের ভেতর দিয়ে মানুষেরই মধ্যে কবি ও কবিতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে নির্দেশিত । 'বহিরাগত' তারই অভিজ্ঞান । এই মানুষ আক্ষরিক অর্থে জনমানুষ । ১৪১৩ বঙ্গাব্দে ক্ষমতার অত্যাচারে মৃতা সিঙ্গুরের তাপসী মালিককে মনে মড়ে নিশ্চয় । তাপসী কৃষককন্যা । জনকদুহিতার মতো । পীড়িত এবং দগ্ধ হতে হয়েছিল তাঁকে । তাঁর বাবা মনোরঞ্জন মালিক, 'বহিরাগত' র দ্বিতীয় কবিতায় যাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'গণঅধিনায়িকাজনক' বলে । ধনদেবী লক্ষ্মীকে নয়, ধান্যশ্রী তাপসী মালিককে 'গণঅধিনায়িকা' বলতে গেলে যে-ধরনের কাব্যিক সংস্কার বিসর্জন দিতে হয়, এবং যে-ধরনের রিক্ততায় চিহ্নিত মনকে গ্রহণ করতে হয়, তারই সামর্থ্যে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল 'বহিরাগত' [বিষয়মুখ, জানুয়ারি ২০০৮] প্রণয়ন করেছিলেন । কবিতার শিল্প এখানে অধিকন্তু ।

পার্থপ্রতিমের কবিকৃতি নিয়ে বহু এবং বিস্তৃত আলোচনা নিশ্চয় হবে । আমি শুধু একটিই প্রসঙ্গের কথা এখানে বলতে চাইছি । রাজাজ্ঞার বিপরীতে, ক্ষমতার স্পর্ধা ও আস্ফালনের বিরুদ্ধে কবিতার শক্তিতে তিনি কতখানি আস্থাশীল, আমি যেটুকু জেনেছি, তা-ই বলব ।

২০০৭-এর ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলি চলল জমি আগলে দাঁড়িয়ে থাকা সমবেত কৃষকের বুকে । মৃত্যু হল বেশ কিছু জমিজনের । পার্থপ্রতিমের ব্যবস্থাপনায় ১৪ জুলাই মহাবোধি সোসাইটি হলে জমিঅধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সভা ডাকা হল । সেখানে আমাকে বক্তব্য রাখতে হবে, একদিন উনি ফোন করলেন অনুমতি চাইতে । বললাম, " আমি কী বলব? আর আমার কথায় কী এমন হবে? " জবাবে উনি জানালেন, " আপনি কবিতা লেখেন, আপনার উচ্চারণের শক্তি পূর্বনির্ধারিত । " সম্মতি জানিয়ে, ফোন রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম । 'কবি' এই অভিধাটিকে সে-দিন অপূর্ব এক ধারণায় বুঝতে চেষ্টা করছিলাম । নিজের অন্তর্গত শক্তিতে বিশ্বস্ত হওয়ার একটা সুসমাচার পেলাম যেন । মনে আছে, যখন সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলাম, আমার ভাষা আমার আত্মপরিচয়ের মর্মবাণী হয়ে উৎসারিত হচ্ছে । শুনে কার কী হচ্ছিল জানি না, আমি নিজে যে সেই স্ফুলিঙ্গে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম, তার অভিঘাত আজও আমাকে ভূমিষ্ঠ সত্তার প্রতি নিবেদিত করে রাখে । এই ঘটনার অনুবর্তী হয়ে কিছুটা হয়তো অনুমান করতে পারি কবি ও কবিতায় পার্থপ্রতিমের বিশ্বাসের স্বরূপ কীরকম ছিল । বলাই বাহুল্য, সামান্যই অনুমান করি মাত্র । এই উপলক্ষে এই কথাটি জানিয়ে রাখি, পর পর দুটি সভা হয়েছিল, যার সমূহ আর্থিক দায় তিনি একা নিয়েছিলেন, কায়িক এবং মানসিক শ্রমও অধিকাংশই ছিল তাঁর ।

যে-অভিপ্রায় আগ্রাসী শাসকের বিরুদ্ধে কবি-লেখকদের সমবেত করতে উদ্যোগ সঞ্চার করেছিল তাঁর মধ্যে, সেই অভিপ্রায়ই আরেক মাত্রায় তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে 'বহিরাগত' । তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল 'উনিশশো উনষাটের নেতৃহীন চাষী-আন্দোলন' । তাঁর কাছে বাসাংশকে দিয়ে ত্রিকালউত্তীর্ণ জমি নষ্ট করে দেবার প্রক্রিয়া মায়ের সঙ্গে পুত্রকে মৈথুন করতে বাধ্য করার মতো কদর্য । শুধু নররক্ত নয়, জগদ্দল এক রাজনৈতিক দল তুষ্ট হতে চাইছিল 'ভূমিরক্তে' । কৃষককন্যাকে হত্যা ও তাঁর মৃত্যু রাজকর্মচারী উচ্চবর্গ ও দলদাসের কাছে নেহাত তুচ্ছ কিছু একটা । এইসব হিংস্র উন্নাসিক অবজ্ঞা মেরুদণ্ডে হিমের কামড়

বসিয়ে তাঁকে যেন প্রত্যক্ষ করিয়ে দিয়েছিল 'সরস্বতীর ক্রোধ' । তাঁকে লিখতে হয়েছিল, "গীতবিতানের 'পরে আজ/ নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের রক্ত লেগে আছে;/ মহাকাব্যে লেখা রক্তস্রোত/ সে রক্তের থেকে আরো বেশি, নিশ্চয়ই বেশি,/ কিন্তু এ নতুনরক্তে/ মানবীশোণিত বড় বেশি । " বাংলার ত্রস্ত নীলিমা দেখেছিলেন জীবনানন্দ, পার্থপ্রতিম দেখলেন 'অর্ধসত্য স্বপ্নের এক খণ্ডহর' বাংলায় । তবু 'বাংলার কবিকে শুধু পেতে হবে এক স্বপ্নভঙ্গের নির্ঝর' । ক্ষমতা তাঁর কাছে পাথরের গড় । কবির শব্দ, সাগরসফেন তাকে চূর্ণ করে দিতে সক্ষম এমন বিশ্বাস তিনি বুকে ধরে বেঁচে ছিলেন । 'হত্যাগ্রহীদের মোকাবিলা রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব' এই নিরুদ্বেগ মন্তব্যের মুখের ওপর পার্থপ্রতিমের প্রশ্ন "রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো গণনীতি এখনো কি স্পষ্ট করা সম্ভব হবে না?" কী সেই গণনীতি? কবিতা? অন্য আরও অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু জগদ্দল ক্ষমতাকে বিপর্যস্ত করতে পার্থপ্রতিম কবিতার শক্তিকে অনির্বাণ চিত্তে ধারণ করতে যেকোনোরকম প্রস্তুতির ভেতর যেতে প্রস্তুত ছিলেন । 'বহিরাগত' তাই তাঁর কবিতার অনিবার্য অভিব্যক্তি ।

তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন সনেট নেহাত কোনো কবিতার আঙ্গিক নয় । সনেট পুঞ্জিভূত শক্তি । সনেট দৈবী প্রেরণা । তার রয়েছে আরও অনেক অভিঘাতের মতো দুঃশাসনের সিংহাসনকে ধ্বংস করবার আশ্চর্য তেজ । একটি পত্রিকাকে উপলক্ষ করে ২০০৮-'৯ সাল নাগাদ নতুন সনেট সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হন । লক্ষ্য কিন্তু দুঃশাসনের উৎপাটন । সে-কাগজ বেরোয়নি । তবু ২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানার অবসান হলে তিনি ঘনিষ্ঠ অনুজাত কবিদের কাছে চোয়াল শক্ত করে বলেছিলেন, প্রকাশও দরকার নেই, যথার্থ সনেট লিখিত হলেই জগতের অমঙ্গলের নাশ সম্ভব । ভাবতে ভালো লাগছে, আমাদের সময়ের এক বাঙালি কবি কবিতার শক্তিকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন । এই ভেবে, কবিতা লিখি, শুধু এই কারণে, নিজেকে অপার শক্তির অধিকারী বোধ করছি, আজকে, এমন দুর্দিনে ।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল - গদ্য ও কবিতা

রক পাখির সঙ্গে সমুদ্রে, পাহাড়ে

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

সাহিত্যপাঠক, সমালোচক কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্রবয়সী কোনও কবিতাচেষ্টিতের ভূমিকায় থেকে এই লেখাটা লিখছি না : এসব চোখ এই লেখায় এসে পড়তে পারে ঠিকই, কিন্তু আসলে এটা একটা ব্যক্তিজীবনীর দু'-তিনটে টুকরো-জীবনানন্দজড়িত লেখা ও কথা যেখানে ভর করেছে । খুবই নির্দয় লেখা - এ লেখাকে কেউ 'সিরিয়াসলি' বা সুগভীরভাবে নেবেন না আশা করব ।

আমার বাবা এই কলকাতা শহরের এক সময়কার অতিবিখ্যাত প্রেসের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বলেই, জীবনের প্রথম ১০ বছরের মধ্যেই জীবনানন্দের নাম আমি জেনে যাই । বছর দুয়েকের মধ্যেই পাড়ার লাইব্রেরি থেকে জীবনানন্দের বইও এসে পড়ে, কারণ এ সময় আমি জেনে গিয়েছি ছাত্র হিসাবে আমি সিকিমাথার ছাত্র ।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর শেষ জীবনের বাড়ির গা ঘেঁষে বসবাসের জন্যেই হোক বা ক্রীড়াবিহীন বাল্যকালের জন্যেই হোক, আমি কুখ্যাতরকমে প্রিকশ্যস ছিলুম । রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ফুরচ্ছে না এমন এক বাষট্টি সালে জীবনানন্দ পড়তে গিয়ে দেখলুম এ জিনিস রীতিমতো অচেনা এবং চেনা । চেনা এইজন্যে যে উত্তর কলকাতার বরানগর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত আর রাসবিহারী-গড়িয়াহাট-এর দিকেও (যে পর্যন্ত আমার যাতায়াত ছিল) তার পথঘাটের আবহে যথেষ্টই এর সুর ধরা আছে - সব থেকে বেশি ধরা আছে কলেজ স্কোয়ার, মেডিক্যাল কলেজ, তখনকার সিনেট হল ও মির্জাপুরের আঞ্চলিকতায় । অথচ কথার শিকড়গুলোর যে শূলো বা মোটা অসমান গুঁড়ি, তার সঙ্গে তখন পর্যন্ত পড়া বাংলা কবিতাবলীর কোনও মিল নেই । অন্যান্য কবিরা গাছতলাটাকে সিমেন্টের গোল কি চৌকোনা বেদি দিয়ে ঢেকে দেন যাতে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার কি লোকজনের বসতেটসতে অসুবিধে না হয়–ইনি কেমন এক খোট্টাই-ধরনে মোটা, উঠে থাকা গুঁড়ির উপর সাদা ও কালো পাথর ফেলে রেখেছেন । খুব সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হল । রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গীতিপদ আমার খুব কম মুখস্থ ছিল না, আরও অনেকেরই ছিল, কিন্তু এবার সেখানে একটা চোট পড়ল; হয় জীবনানন্দ সত্য নয় রবীন্দ্রনাথ সত্য, এমনএকটা মল্লযুদ্ধ ভিতরে চলতে থাকল । আর একটা ব্যাপার ছিল আমার, তা হল, কবিতা-দর্শনমাত্র আমি সেটার প্যারোডি করার চেষ্টা করতুম । এ ক্ষেত্রেও করলুম, কিন্তু ঠিক জমল না, বরং নিজেই কেমন বাঁকা নখের ঘা খেলুম । অনেকদিন বাদে সেই প্যারোডির একটা লাইন মনে পড়ল, বাংলার ইয়ে আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর ইয়ে / দেখিতে যাই না আর! - এর জন্যে, এখনও অলজ্জিতই আছি ।

কী হত বলা যায় না । বাকি সব কবিতাই দেহী-মানুষ লিখছে বোঝা যায়, কিন্তু ইনি আলাদা–এমন কেউ লিখছে এর নামাঙ্কিত লেখা যা দেহী ও বিদেহী দু'জনই লিখছে । সে ধারণা এখনও যায়নি । যাই হোক, এই সময়টা মানে বাষট্টির শেষদিকে আমি বেঁচে গেলুম কৃত্তিবাস আর অন্য কিছু কবিতার কাগজ পেয়ে, মানে ষষ্ঠদশকে এসে পড়া (যাকে ফিফটিজ বলা হয়) তরুণতম কবিদের সব মিলিয়ে যে ইডিয়মটা, তা রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের মাঝামাঝি আর একটা রাজ্যের বলেই, সেখানে ঢুকে গেলুম ।

হায়ার সেকেন্ডারির আগে ও পরে তো এখানেই সর্বশির জড়িয়ে পড়লুম । সাহিত্য-আড্ডায় চলে এসেছি । বহু ধুন্ধুমার তক্কাতক্কি হয়েছে । এ সময় স্নেহাকর ভট্টাচার্যের লেখা ভাল লেগেছিল জীবনানন্দকে নিয়ে, বুদ্ধদেবকে জবাব যেটা

দিয়েছিলেন–তার কথা বলছি । কবিতা পরিচয়ের জীবনানন্দ-বিষয়ের লেখাগুলি কফি হাউসে প্রুফেই দেখে নিয়েছিলুম । এখন অবশ্য ওই প্রথমদুই দশককে–১০ থেকে ২৯ পর্যন্ত সময়কে খারিজ করতে ইচ্ছে করে । মনে হয়, তিরিশ থেকে ভাবি । কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না । ৬৭ সালে অনন্যায় - বীরেন সিমলাই বার করতেন রিডার্স ডাইজেস্টের ধরনে এই ডবলক্রাউন চমৎকার ছাপা পত্রিকাটি–প্রথম পড়েছিলুম জীবনানন্দের গ্রাম ও শহরের গল্প । তারপর বিলাস, যে মালার্মে আনিয়ে রেখেছিল, কিন্তু পড়ার আগেই মরে গেল । যাই হোক, মাল্যবান, মানে ১৯৭৪ - আমার পঁচিশ থেকে জীবনানন্দকে আবার হিসেব করতে হল ।

তাঁর গল্পে খানিক-ভর-দেওয়া লেখা যদি না পাওয়া যেত, জীবনানন্দ বাংলা ভাষার কবিদের জেমস করবেট হিসেবে অন্তত আমার মনে আমৃত্যু থেকে যেতেন । এই নয় যে তাঁর কবিতার মুসাবিদার সমস্তটাই আমি অপ্রতর্ক্যরকমে নিতে পেরেছি । কোনও কোনও জায়গায় তিনি 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' ('নীড়ের' বন্ধনীতে বসবে, মানে নীড়ের পাখির, বনলতা সেন যেমন কঠিন ও সামাজিক মেয়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকৃতি, তাঁর তাকানো নীড়ের পরিচিত পাখিরই মতো হওয়ার কথা, যিনি পুরুষের দুর্দশাকে ছেলেদের খেলার মালিন্য হিসেবে নিয়েছেন, কিন্তু জীবনানন্দ জানতেন পাখি আমার নীড়ের পাখি হয়ে বসে আছে–তো মার হ্যাঁচকা!) লিখেছেন, কোনও কোনও সময় 'নগ্ন' শব্দটাকে একদম মানবাবয়বের ঘৃতকুমারী-থাকা কোমলতা, adipose tissue-র অর্থে খুবই জোরদার করে (যুক্তিও আছে ; 'পেলব'লিখতে পারেন না, জীবনানন্দরা রাজশেখর বা সাহিত্যদর্পণ পড়েননি তা তো আর নয় । আর একটু বলে নেওয়া যাক যে নগ্ন নির্জনহাত দেখে যাঁরা কাতর হয়ে পড়েছেন তাঁদের একবার 'ঝরা পালক'উলটে দেখা দরকার, ওখানেও কিশোরীর 'নগ্ন' মুখ বসিয়েছেন, 'নারীর' মতো একটা যাত্রাপালার শব্দ লিখেছেন বহুবার–এই নিন্দিত নারীমুখের জন্য ওই দোষ একটু সামলেছে । জীবনানন্দ এমন লোক যিনি 'আমূল' শব্দটা ঠিক জায়গাতেই লেখেন, অন্যত্র 'আভিত্তি' ; নৃচেতনা ও ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিতে নৌচালনার বিষয়ে তিনি কখনই লিখবেন না 'সমাজের আমূল পরিবর্তন চাই', 'আভিত্তি' লিখবেন । সেই তিনি, মাঝে মাঝে 'নারী' বলে আমার মাথা খারাপ করে দেন । নারী বললে আমি কিস্যু বুঝতে পারি না, গর্ভস্থ ভ্রূণ থেকে জরতী সকলেই তো নারী । মহিলা বললে তবু প্রথম তারুণ্য-অতিক্রান্তা বিপজ্জননীদের কথা (আশাপূর্ণার ভাষায় 'এঁরা বড়ো ডেনজারাস-টুয়েন্টিফাইভ আপ' !) মনে আসে, রমণী বললে যৌনের দিকটা না মনে এসে পারে না । মানবীও নারীর মতোই এক অতিব্যাপক শব্দ, তবু নারীর থেকে ভাল, নাড়ি-নাড়ি মনে হয় না । আসলে 'নারী' শব্দটি উচ্চারণের যুক্তিশূন্য ঝোঁক বাঙালির মধ্যে আছেই - নড়নড়ে নরত্বের কারণে । নিজের সমসাময়িকদের বিবশতা বিধুরতা (কবি শিবশম্ভু পালের ভাষায় 'আবাগী আবেগ') জীবনানন্দকেও মাঝে মাঝে ঢেকে ফেলত । নিশ্চয় আমাকেও ফেলে, তবে 'নারী' শব্দের ক্ষেত্রে নয়, এই শব্দটা শুনলেই ফিসফিস করে অন্য কেউ বলে ওঠে, 'আমি নারী,আমি পাপীয়সী' -

ভুল হল, 'মহীয়সী' হবে । আসলে বেশিরভাগ 'নারী'শব্দের প্রয়োগে সেই মহীয়সী এমন মাখানো থাকে - জীবনানন্দের প্রয়োগেও এমনি পূর্বনির্ধারিত মহীয়সী সে সব 'নারী' যে আর বলে কাজ নেই ।

জীবনানন্দ তিনরকম ছন্দে (বাঁধা) ও অবশ্যই আবাঁধা ছন্দের ভিতর দিয়ে গেছেন । কার যেন লেখায় দেখলুম, পয়ার-অক্ষরবৃত্ত নাকি মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দই হচ্ছে বাংলা কবিতার প্রাণ ও আত্মা । ঠিক এর উলটোটাই সত্যি । পয়ারটা বাংলা কবিতার নিরাত্মা ছন্দ, সেটা অন্য ছন্দসূত্রগুলি নয়, তাদের আত্মা অত্যন্ত প্রখর, লেখকের আত্মার সঙ্গে তাদের একটা

বোঝাপড়া ভালমতো থাকা দরকার । নইলে এ সব জিনিস 'আমাদের কেন মিলনঋতু নেই, ছায়া'?-র মতো যুক্তিহীন ছন্দপতনের দিকে নিয়ে যায় (আমরা মিলনঋতুহীন কেন, ছায়া ? অন্তত হওয়া দরকার), ছন্দটা কেন আছে অনেক সময়ই ধরা যায় না, তৃতীয়ত, ছন্দ একদিকে যায় তো লেখার মেজাজ বা সাংকল্পিকতা আর একদিকে যায় । জীবনানন্দে ছন্দ-ভুল যা আছে তার সমস্তই অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর (মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তে নেই) সুতরাং অতি উপাদেয় । কিন্তু তাঁর মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তে থাকা কবিতাকুল কখনই সেই উচ্চতা বা অতলমুখ পায় না যা তাঁর পয়ার পায় । মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের আত্মার সঙ্গে তাঁর খুব ভাল বোঝাপড়া হয়নি । সেগুলো দেখলে মনে হয় গাধার পিঠে মনীষী চেপেছেন, গাধার মুখে বসন্ত থেকে বর্ষার ছ' মাসের হাসি লেগে আর মনীষীরমুখে শরৎ থেকে শীতের মিহি ছ' মাসের হাসি । শঙ্খবচন ধার করে বলা যায় যে, জোড়ের কাজটা মিলিয়ে গেল না ।

এই লাইনের কুলি-মজুর হিসেবে এটুকু বলতেই হচ্ছে যে এটা হওয়ার কথাই ছিল । জীবনানন্দ প্রবন্ধ-পাঠকের বলয় থেকে এসেছেন । ইয়ে, একটু সেরিব্রাল বেশি–তা ছাড়াও, 'ঝরাপালকে' তাঁর ব্যর্থতার কথা জীবনানন্দ ভালই জানতেন, সুতরাং আবার যখন মাত্রাবৃত্ত-স্বরবৃত্ত হাতে তুলে নেন তখন সতর্ক ছিলেন যে এরা নাচিয়ে না দেয় আগের মতো । এখানে তাঁর স্বাভাবিক সমাধিগুণ (শিষ্ট ও ধৃষ্ট শব্দাবলিকে একঘাটে জল খাওয়ানো) মার খেয়ে গেল । এমন হতে পারে যে, ঝরাপালকের পরের যে সব মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত-কাঠামোর কবিতা-তা যখন জীবনানন্দ লিখছিলেন তখন তাঁর জীবনে কিছু সহৃদয়সমাগম হয়েছে, তত একা নেই তিনি, যতটা একা থাকার জন্য তাঁকে নির্জনতার বা জনান্তিকের অনুচ্চকিত আন্ডারটোন (Sotto Voce বা সটো ভৌসির একখণ্ড জ্যান্ত নমুনা হিসেবে) কবি হিসেবে চালানো হয়েছিল । এ সব ভাবলে মজাই লাগে । বহু উচ্চকিত স্বরাবলি জীবনানন্দের কবিতায় আছে, থাকবেই তো! গানকে যেমন উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরেতে থাকতেই হয়, কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয় । মন্দ্রসপ্তকে কি অতিমন্দ্রসপ্তকে যখন কোনও গায়ক আসেন তখন কি বলা যায় তিনি জনান্তিকে গাইছেন? সে যাই হোক, ততটা একা না থেকে, একটু হয়তো বিস্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি । কী আর করা যাবে ।

আমার আর একটা অস্বস্তি আছে তাঁর 'বুদ্ধ-গান্ধী-সোক্রাতেস' শব্দবন্ধে ; শব্দের মনোশ্রাব্যশিল্প (যে কারণে জীবনানন্দ নবীনের সঙ্গে তৃণের মিল দেন, ওষ্ঠ্য-উচ্চারণের মিল এটা নয় কিন্তু চিত্তশ্রবণে পুরোপুরি গ্রাহ্য অন্ত্যমিল) বাদ দিলে, এটা কী হল? গান্ধী বা গাঁধি (গাঁধি যদি তখন অমলেশ ত্রিপাঠী চালু করতেন, জীবনানন্দ আদৌ এ শব্দ বসাতেন কি না সন্দেহ হয়,সন্দেহ হয় শান্তি ভ্রান্তি শ্রান্তি ক্লান্তির ধ্বন্যাত্মক সহচরী হিসেবে শব্দটা চলে এসেছে) কোনওমতেই অস্পষ্ট এক বা বহু বুদ্ধ এবং সক্রেটিসের সঙ্গে এক বন্ধনীতে মাননীয় হতে পারেন না । ১৯২০-১৯২৯ পর্যন্ত কাইজার অফ হিন্দের যে জ্যোতির্বলয় তা অনেকটাই স্তিমিত হয়েছিল ১৯৩০ থেকে । সন্দেহ হয় যে, এই তিনটি শব্দের একত্রিতির সঙ্কেতকে জীবনানন্দ ভারতীয় / বাঙালি বা নিছক সত্যান্বেষীর চোখে দেখেননি, তিনি তাকিয়েছেন তৎকালীন মনস্বী হিসেবে খ্যাত কিছু ব্রিটিশ লেখকের দিকে - তাঁদের আলোচনার রুচির রঙে এখানে তিনি রঙিন । এই মনস্বীরা ধীমান ঠিকই, কিন্তু রাজনৈতিক কপোত বা dove সম্প্রদায়ের ।

অথচ, হিন্দিতে যাকে বলা হয় 'অদা', তা জীবনানন্দের যথেষ্ট; 'কেন, ভালই তো লিখেছে মার্কস' –এই সংলাপ এক Socialite গোছের মহিলাসংলাপে তিনি বসিয়ে দিতে পারেন, বা ফ্রয়েড প্রসঙ্গে, 'হিয়েনায় যত মনোব্যাধিগ্রস্ত আসতো তো

তাঁর কাছে, তা ঘেঁটে কি আর মানবজীবনসারাৎসারের সুরুয়া করা যায় ?'এ সব অক্লেশে লিখেছেন । সোজা কথায়, নাম ফাটছে কারও দেখলে বাঙালের মতো হাউড়ে-পড়া - তাঁর ধাতে ছিল না । তা হলে, গান্ধীপ্রসঙ্গে এমন কেন । যদি ধরে নিই যে জ্ঞান ও অহিংসা–এই দুটো শব্দের তখন বিপুল রমরমা–এই সব শব্দের বরীয়ান মেদুর গরীয়ান বিধুর কাব্যিকতায় উড়ন্ত হতে জীবনানন্দেরও সাধ ছিল, তা হলেও বলতে হয় অন্তত এ ক্ষেত্রে পোয়েটিক লেজিসলেশন বা যথার্থতৌল ছিলেন না তিনি, স্টক সেন্টিমেন্ট নিয়েই কারবার করলেন; যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেন যে ধর্মবক তাঁর যথার্থশব্দচঞ্চু তাঁর ন্যায়শব্দচঞ্চুর ব্যাদান ও আঘাত - যা জীবনানন্দই বহুদিন বাদে ভারতীয় কবিতায় আনেন তা এ ক্ষেত্রে-এমন কিছু কিছু জায়গায় অনুপস্থিত থাকল ।

এ সব সত্ত্বেও, কবিতার মুসাবিদায় তিনি মানুষী ছাড়াও শুশুকের- কুকুরের - আলবাট্রস পাখির যে সব সংবেদনসম্মেলন রেখে গিয়েছেন, এমনকি ঝরা পালকেও এ সংবেদন হয়তো অল্প আছে যৌনে বিজড়িত–সেটা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না । 'ওঁর আধুনিকতা আরও আট হাজার বছরেও পেরনো যাবে না', এক অনুজ কবি'৮৩ সালে আমাকে বলেছিলেন । 'আধুনিকতা'শব্দটা প্রায় 'নারী'র মতো; যাকে খুব ভাল করে ধোনা - ধুনে দেওয়া হয়নি সেইটেই আধুনিক, এই ঠাট্টাটা সব সময়ই মনে পড়ে । সেটা কথা নয়, কিন্তু আট হাজার বছরের মধ্যে যে অনন্তবিজয় শব্দটা থেকে যায়, তার প্রসঙ্গে, এক যুধিষ্ঠির ঠিক এসে পড়েন । বোঝা যায়, জীবনানন্দের মূল বিষয় ধর্ম অধর্ম আপদ্ধর্ম ও ধর্মসঙ্কট এবং ধর্মতত্ত্ব গুহানিহিত জেনেই, তিনি নিজে আর এক গুহামানব । আমরা রবীন্দ্রনাথকে মিনারের উঁচুতে রাখা মঞ্চে কথা বলতে শুনি, নীচে আমরা থাকি ; কিন্তু জীবনানন্দ কথা বলেন এমনভাবে যেন তাঁর কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত মাটিতে প্রোথিত এবং মুখ উঁচু করে স্টেডিয়ামের সমবেতদের দিকে বা আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি কথা বলে চলেছেন । অথবা, পাশেই, দেয়ালের গর্ভ থেকে কথা বলে চলেছেন । এই স্বরকৌশল আগে ও পরে কখনই আসেনি–মনে হয় আর আসবেও না । তাঁর বিশিষ্ট অন্তঃশারীরিকতা গরিলা বাইসন বা সাদা তিমির মতোই - যে সব হরিণ দেখা দিয়েও বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে - তাদের মতোই রূপকথার অমোঘবীর্য থেকে যাবে; তিনি বাংলা কবিতার এমন এক স্ট্যাচু অব লিবার্টি থেকে যাবেন যাঁর অবয়বের আদল টমাস পেইনের ধাঁচে গড়া হয়েছে । তাঁর বহু প্রতিকূল হতে চাওয়া সমালোচনা পড়েছি এবং কম্পিতহস্তে মাল্যদান-ধরনের অনুকূল সমালোচনাও পড়েছি । পড়ে, উপকার প্রায় সর্বত্রই হয়েছে । বিনয় মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার টেপবদ্ধ করে আনেন সুব্রত সরকার, তার অনুলিখনের দায়িত্বে আমি ছিলুম । বিনয় বলেছিলেন, 'জীবনানন্দ একটাও আনন্দের কবিতা লেখেননি' । এমনিতেই আমি 'এর কবিতা' যেমন অবক্ষয়ের কবিতা বা এই জাতীয় শব্দ বুঝতে পারি না । আনন্দ বলতে, বিনয়, মনে হল, শান্তরসের সৌহার্দ্যময় রচনা বোঝাচ্ছেন । বা সহজ আনন্দ । নানা কারণে সহজ আনন্দ মানুষের থাকেই, কিন্তু তা কবিতা লিখতে পাঠায় না কাউকে । কবিতার উৎপত্তি নির্মাণ ও পরিণমন সব কিছুই জটিল আনন্দ - পুরাণে শিবকেই একমাত্র জটিলানন্দ বলা হয়েছে । সহজ আনন্দেই যাঁদের অভ্যেস, তাঁরা পদ্য পর্যন্ত পড়তে পারেন, কবিতার দিকেআর আসেন না । একটা সমতলের দুর্গাপুজো, অন্যটা হিংলাজ বা মানসে যাওয়া ।

তা হলে কবিতার উৎপত্তি নির্মিতি পরিণমন কিসে? এর উত্তর হিসেবে যে শব্দটা আসবে সেটার বাংলা–মানে ইংরেজি তর্জমা আমার জানা নেই । শব্দটা শুনতেও ভাল নয়– রভস । কেমন অস্থানে গাঁইতি বা শৃঙ্গপ্রহার আসন্ন বলে মনে হয় বাংলা উচ্চারণে, সংস্কৃত উচারণে অবশ্য'রাভাসা' - আকারগুলি হ্রস্ব । রতিরভস বা প্রণয়রভস লিখেটিখে এর বারোটা নানা বাঙালি কবি বাজিয়ে দিয়েছেন, তবু এর মানেগুলো যেন সম্ভবপর পাঠককে জানাচ্ছি । বেগবত্তা, তীব্রতা, উৎসুক, ব্যগ্রতা, হর্ষযুক্তি,

হর্ষজনকতা, বলাৎকার, হঠ, আতিশয্য, আবেশ, প্রেমোৎসাহ, উৎসাহ, নির্বিচার, ক্রোধ, অনুতাপ, অতিস্পৃহ্য, পৌর্বাপর্যবিচার, বিলাস, রঙ্গ, রহস্য, পরিহাস, রসাবেশ, প্রেম, বিহার, বৈদগ্ধ্য, কাপট্য, শঠতা, রসকলা, বলপ্রয়োগ, বাহুযুদ্ধ - এ সবই রভস শব্দের অর্থ ।

কিন্তু আমি খারাপ জায়গায় চলে যাচ্ছি । আসল কথা, কবিতার জীবনানন্দে এমনকি প্রবন্ধের ও গল্পে-অল্প-ভর দেওয়া গদ্যগুলির যে কবিতাংশ সেখানে আমার অসুবিধে সামান্যই হয়েছে - জীবনানন্দের থেকে একমাসের ছোট শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে কাজে লাগিয়েছিলুম বলে । শরদিন্দুর দু'টি গল্প জীবনানন্দকে টের পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট । একটি গল্পের নাম 'সবুজ চশমা', অন্যটি 'চিরঞ্জীব' । সবুজ চশমা গল্পে, এমন একটা চশমা একজন পান যা পরলে সবুজ আমলকী রঙের তরল আলোয় বিদেহীজগৎকে দেখা যায় । সূর্যগ্রহণের আলো, এই আলো ও এই জগৎ, জীবনানন্দে, প্রায় সর্বক্ষণ লভ্য । চিরঞ্জীব গল্পে এমন একজন লোক আসে যে অনায়াসেশতাব্দী-শতাব্দী আগেকার কথা সাধারণভাবে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলে, হঠাৎ-হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরিত হয়–মানুষমাথার যে সুনির্দিষ্ট গদ্যবদ্ধ প্রশাসন, তার বাইরে কোথাও থাকে সে । এই দুটো পড়লেই, বিবেক, রভস প্রভৃতি জটিল শব্দে না গিয়ে কবি জীবনানন্দকে জানা হয়ে যায় । চিরঞ্জীব গল্পের শেষে দেখা যায় অবাস্তব, ছাড়া ছাড়া কথা বলা লোকটা আসলে পাথুরে প্রমাণ রেখে গিয়েছে তার সত্যচারিতার, অবিশ্বাস্য দীর্ঘজীবিতার এবং পিশাচের সঙ্গে চিরযুধ্যমানতার - এইদিকে থেকে ভাবলে, জীবনানন্দকে জানা-বোঝার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট । তবু সবুজ চশমাও পঠনীয়, কারণ সে জিনিসটা 'এমন একটা freak যা আর তৈরি হবে না' ।

যেটা হয়েছিল আমার, তা হল, জীবনানন্দের পর সুধীন্দ্র-বুদ্ধদেব ইত্যাদি পড়তে গিয়ে দেখলুম এঁদের শব্দের কান এবং কাণ্ডজ্ঞান না কমন সেন্স কোনওটাই ভাল নয় । অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলা হয় ভাবোক্তি অর্থাৎ বিবশ বিধুর আবেশ তৈরি করার আয়োজন, সেগুলোতে অনেক বেশি টান এঁদের, অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথ নজরুল বা আরও অনেকের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিজীবিত - কিন্তু এভাবে স্মরণীয় পদ্য অবধি যাওয়া যায়, স্মৃতিবিস্মৃতির থেকে কিছুবেশি পর্যন্ত পৌঁছনো যায় না । যদিও এঁদের পদ্যপরিশ্রম অতুলনীয় । প্রথম তারুণ্যের অগ্রজ মিত্র উৎপলেন্দু চক্রবর্তী 'স্মরণে' বলে একটা কাগজ করতেন, তাতে সুনীল সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা খুবই ঠিক কথা । কিন্তু রসোক্তি বা আসল কবিতা নিয়ে কিঞ্চিৎ পিউরিটান ঢঙের সাহেবি, সভা-উজ্জ্বল অধ্যাপনা করা যায় না–সিংহ এমন এক পশুরাজ যার অভিষেকের দরকার নেই, করলেও মনে হবে এ তবে সার্কাসের সিংহ । যদিও, সিসৃক্ষু বা রুদ্র সাহিত্যকে, এককথায় বিপ্লবপ্রাণসার সাহিত্যকে টোলে এনে সভ্যশিষ্ট পালনমূলক করার, পোষ মানানোর চেষ্টা বহুকালই হচ্ছে এবং হবে ।

যত ঘাপলা করেই লিখি না কেন, সবুজ চশমার সূত্রে প্রেতলোকের কথা একটু এসেই পড়েছে । প্রথম বয়েসে যে সব সন্দেহ ছিল আমার জীবনানন্দকে নিয়ে, এখন দেখছি তার অনেকটাই সত্যি । 'প্রেত' এক বিশাল ব্যাপার, তবু আমরা যারা প্রেতশিলা আকাশগঙ্গা পাহাড় প্রেতবিষ্ণু বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখেছি এবং সেইসবের শাব্দস্কন্দন জীবনানন্দে রয়েছে জেনেছি–তাদের কাছে কবুল করা যাক যে আমার সেই প্রথম বয়েসের সন্দেহ আপাতত শেষ আঘাত দিয়ে চলে গেল কিছুদিন আগে । সেটা কর্ণোপকর্ণিকা থেকে এখন ছাপার অক্ষরেও এসে গিয়েছে । 'যম'বইটির লেখক ভূমেন্দ্র গুহ এখন অতিপরিচিত নাম, তাঁর কাছ থেকেই শোনা গল্প । একই ছাঁচের ঘটনা একটি ঘটে ১১ ও ১২ অক্টোবর ১৯৫৪, ছোটভাইয়ের বাসায় জীবনানন্দ গিয়ে জানতে

চাইছেন দেশপ্রিয় পার্কের কাছে কোনও জায়গায় ট্রামের নীচে পড়ে কেউ আহত হয়েছেন কি না । পরপর দু' দিনই একই দৃশ্য দেখেন জীবনানন্দ, যা আর কেউ দেখেনি ।

প্রেতাবিষ্টতা? একেবারেই নয় । প্রেতানুসন্ধানীর এমন হয় । জীবনানন্দ সেই সামবেদীব্রাহ্মণ যাঁর প্রেত আবাহনে স্বাভাবিক অধিকার থাকে - দয়া করে কেউ যেন আবার 'দাশগুপ্ত বামুন হয় কী করে'গোছের প্রশ্ন ফেঁদে বসবেন না । কলেজে বিদ্যে বেচতেন বলেও ব্রাহ্মণ বলছি না । এই লেখক নিজের ছান্দস, অর্থাৎ ছন্দঃপ্রবহণ ও সাঙ্গীতিক সংকল্প বিষয়ে খুব - খুব কেন পুরো মাত্রায় অবহিত ছিলেন, 'একটু রজনে ঘষা তারে বাঁধা' –নিজের একটা লেখা সম্পর্কে হালকা চালে চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন । সামবেদীয় ব্রাহ্মণেরা কী করতেন, মনে রাখুন । না, বিষয়ে আর কিছু না । ঘরের সব কথা পরকে বলতে নেই । তা ছাড়া আমি এখন লেখাটাকে ছোট করে আনব । তাঁর মৃত্যু? এখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাই না, গত ১৬ অক্টোবর '৯৮ কবিতা সিংহ চলে যাওয়ার পর একরকম বুঝে নিয়েছি যে সব মৃত্যুতেই মানে সব দেহাবসানেই আত্মহত্যা, হত্যা, দুর্ঘটনা ও স্বাভাবিকতা কমবেশির অনুপাতে জড়িয়ে থাকে । অনুজ লেখক দেবাঞ্জন চক্রবর্তী এক লেখায় প্রশ্ন রেখেছেন দেখলুম, 'সিদ্ধি খেয়েছিলেন কি জীবনানন্দ'? আগের দিন রেডিওর আমন্ত্রণে মহাজিজ্ঞাসা নাম্নী কবিতা পড়ে, তার আগের দু' দিন ট্রাম-দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে, জীবনানন্দ ঝপাৎ করে তা হলে সিদ্ধিই খাওয়া যাক বিবেচনায় সে বস্তু খেয়েও থাকতে পারেন, না-ও থাকতে পারেন । কথা হল, অনেকদিন ধরেই - আমার ধারণা ১৯১৩ সাল থেকে জীবনানন্দ পৌরুষ মনুষ্যত্ব কবিত্ব ঐতিহাসিকতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের লোকপ্রসিদ্ধিগুলি খেয়ে আসছিলেন । শেষ দিকে, কিছু সামাজিক সমাদরের শুকনো মিষ্টি খাওয়ায়....

১৯১৩ কেন তা পরে বলছি । রূপসী বাংলা বা বনলতা সেন-এর মতো নাম জীবনানন্দ দিলেন কী করে, সেটাও একটা সন্দেহের মধ্যে ছিল । সত্যিই কি তাঁর চিত্তাবস্থা - অনেকে যেমন বলেন, প্রথম দিকে সীবনানন্দ - বীজনানন্দের দিকে ছিল, পরে, ময়ূখদশায় নিষ্ঠীবনানন্দের দিকে চলে গিয়েছিল? একদিন নীল ডিম করেছ বুনন = সীবনানন্দ, চোখ তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা = বীজনানন্দ, নষ্ট শসা - পচা চালকুমড়ার ছাঁচে = নিষ্ঠীবনানন্দ - এই পর্যন্ত বললেই যথেষ্ট । আমি ৬৫- ৬৮ র দুই কফিহাউস ও অন্যান্য আড্ডার কথা বলছি । নিষ্ঠীবনানন্দ প্রথম থেকেই ছিল মনে হয় । জীবনানন্দ-সতীর্থরা মনে মনে তাঁকে ভালবাসলেও তাঁর চালচলন সমর্থন করতে পারেননি ; তাঁরা যখন জীবনগ্রন্থিকে দেখা-দেখানোর সুরমা চাইছিলেন, তখন জীবনানন্দ যাকে বলে 'লে আয়া জালিম বনারস কা জর্দা'! এখন না হয় তার শাঁওলী সুরতিয়াঁর ওপরে মলমলের কুর্তায় পান খাওয়ার লাল লাল ছিট দেখে নতুন রসের প্রস্তাবনার পুলকের মুখড়া-আস্থায়ীতে আমরা এসে গিয়েছি ।

জেনে ভাল লাগছে যে রূপসী বাংলার অন্য নাম ছিল, বাংলার ত্রস্ত নীলিমা । রূপসী বাংলার মতো কলেজগার্ল স্যার - সুইট সিক্সটিন স্যার বা বন্ধু আমার রসিয়া জাতীয় নাম জীবনানন্দ রাখতে পারেন না বলেই মনে হয়েছিল । বনলতা সেন নিয়ে একসময় আমরা অজ্ঞদের প্রচুর জ্বালিয়েছি । 'উনিই তো সুচিত্রা সেন' –তবে এক অজ্ঞ যখন বলেছিলেন তবে কি ন্যাভামের অবসেশনেই এভাবে চলে গেলেন জীবনানন্দ, তখন আর কথা জোগায়নি । '৫৪-র অগ্নিপরীক্ষা দেখেছিলেন কি না এই কবি, আদৌ জানি না । তবে ছায়া-কানন-চন্দ্রাবতী ফেলে এ-দিকেতিনি আসবেন, এতটা চিত্ররূপময় তাঁকে আমার মনে হয়নি কখনও ।

তা এই নিরন্তর কবিসঙ্গের সুবাদে, জীবনানন্দ সম্পর্কে বিশেষ কথক ছিলেন শংকর চট্টোপাধ্যায় - তাঁর কাছ থেকে, নানা গালগল্প শুনেছি এবং একটিও অবিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখিনি । এ সব এখন কিছু কিছু ছাপাও হয়েছে, বিশ্বস্ততা ও জুটেছে তার সঙ্গে । এই গল্পটা আপাতত বলি । যষ্ঠ দশক অর্থাৎ ১৯৫০-এর উদীয়মান কবিতাবিদ্ধেরা জীবনানন্দ-সকাশে গিয়েছেন লেখা চাইতে । সে দলে নরেশ গুহ ছিলেন । ঘরে একটিই চেয়ার, জীবনানন্দ সেখানেই বসে, বাকিরা দণ্ডিত বা দণ্ডায়মান । 'লেখাটা পাচ্ছি তো'?জীবনানন্দ এর জবাব না দিয়ে পরমবিবেচক পৃথিবীপর্যবেক্ষণশীল সুগাম্ভীর্যে বললেন, 'আচ্ছা, অমুকের জ্যেষ্ঠা কন্যা এখন যেন কোথায় ?' অমুক বলতে তাঁরই এক অতিচাউর সাহিত্যসতীর্থ, যাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন অষ্টাদশীত্বে, শিক্ষায়, রুচিতে, এবং সে ক্ষণে কুমারদ্বীপে অবস্থিতির কারণে এক Belle । সেই ললনা কোথায়, তা সমবেত বিশ-পঁচিশের খারাপ বয়সের সরলেরা জানিয়ে দিয়ে আবার লেখার কথায় আসতেই, জীবনানন্দ, আবার জ্যেষ্ঠা কন্যা এখন যেন কোথায় । আটবার একই প্রশ্নের জবাবে একই উত্তর বা প্রতিপ্রশ্ন পেয়ে, উদীয়মানেরা পলায়ন করেন ।

সমাজছবি হিসেবে এ গল্পের গুরুত্বটা এই জন্যে যে, ৫১-৫৩র সমবেত তরুণদের মধ্যে কেউ এই কথাটাও বলছেন না যে 'ও কথা আগেই বলেছি' । রসিক পুলিশ যেমন অপরাধীকে বলেন 'তুই এই কেসটা খা', তেমনি বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দকে নির্জনতম (Sotto Voce) ইত্যাদি বলে-টলে এমন একটা কেস খাইয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সৎ কবি কিন্তু লুনাটিক যথেষ্টই এমন একটা প্রতীতি তৈরি হয়েছে; জীবনানন্দ এ-মার্কা মজা প্রচুর লুটে নিচ্ছেন । তাঁর অদ্ভুত-রসময়তা অন্তত স্বীকৃত হয়েছে ।

অথচ, জীবনানন্দ একজন বীররসের কবি, একজন চাপা চিরযুদ্ধবাজ । দুটো মহাযুদ্ধ দেখেছেন এটা কথা নয়, জীবনানন্দর সুতীর্থ চোদ্দো বছর বয়েসে হাতে পিস্তল তুলে নিয়েছিল (সে কারণে আমি ১৯১৩র কথা তুলেছি, পশ্চিমে তাঁর শরীর সারিয়ে আনার কথা আর বলছি না ।) 'এটাও যদি ছেড়ে যাই - তাঁর শব্দের তিস্তা স্রোতকেও যদি ছেড়ে আসি, তাঁর ছেলের নাম যে 'সমরানন্দ' - এটা তো ভোলার কথা নয় । ১৬ বছরের জীবনানন্দকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে ভাষা নিয়ে জবরদস্তির অভিযোগ করেছেন । সত্যিই কি তা হয়েছিল ? না । শুধু ইমারত ফাটিয়ে বার হওয়া অশ্বত্থমূলের যে ধাক্কাটা ছিল ওখানে, সেটা রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু বেশি তীব্রমনে হয়েছিল, তাঁর সুমিতির বোধে তিনি এঁকে ধরতে পারেননি । অবশ্য এখন আর জানার কোনও উপায় নেই যে জীবনানন্দের সময়ে ছেলেদের ড্রিল করার লেফটরাইটকে যে 'ঘাসজল' বা 'ঘাসবিচালি' বলা হত, তার কোনও নিগূঢ় রসায়ন তাঁর কবিতার তৃণবীক্ষণ জলবীক্ষণে তিনি সচেতনভাবেই করছিলেন কি না । আপাতত এটুকুই বলি যে, বীররসের পদ্যকার নন জীবনানন্দ, ঝরাপালকে কতকটা তাই হলেও, এবং বীরকে রৌদ্র-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভুত-করুণের চক্রে বারবারই নানা কারণে (রামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন)–প্রফেশনাল হ্যাজার্ড আর কি - গিয়ে পড়তে হয়, অন্তর্পদ্ধতিই নিয়ে যায় । পালপিটবয় যেমত বা । অবশ্যই, বাংলার ত্রস্ত নীলিমা ঠিক এ দিক থেকেও বীররসের নয়, আহত শৃঙ্গার রসের (গ্রাম ও শহরের গল্পকে মনে রাখলেই বোঝা যায় কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে যঃ কৌমারহর... চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে পর্যন্ত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে সময়মতির বদলকে নিষাদ হিসেবে মেনে নিয়ে ।), আর এমন একটা অনুযোগও থাকে যে, কিছু সময় তথাকথিত আলোকময়তা - সদর্থকতার কূলে জাহাজ ভেড়ানোর জন্যে স্রেফ 'কিন্তু' বা 'তবু'তে চাপ দিয়ে গিয়েছেন, পূর্ণযৌবন পুরুষকে যেমন আবালবৃদ্ধবনিতাকে সান্ত্বনা দিতে হয় । 'আশায় মরে চাষা শুনে', আমি আবাল্য আশাবাদী নই - সেকারণে, নিরাশা-হতাশাবাদী হওয়ারও সুযোগ পাইনি । অনেক দিন ভেবেছি এই যে 'নিরাশাকরোজ্জ্বল'শব্দটা জীবনানন্দে জড়িয়ে

দেওয়া, এর আসল কারণ যদিও‘মাধব, হম পরিণাম নিরাশা’ - এই পদাবলিপঙক্তিপাঠক জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা, তবু এটা কি তাই হবে? এটা কি ‘নীরাশাকরোজ্জ্বল’ হবে না, অন্যরকম জলের কল্পনা যিনি করতে চেয়েছিলেন ?

পাঠক (যদি কেউ থেকে থাকেন) বুঝতে পারছেন যে একটু বেশি ইয়ারকিপ্রবণ এই লেখক,এবং সত্যিই তাই । জীবনানন্দের একটি পঙক্তির জন্যে এক বাঙালি কবিকে দেখলেই আমার একটু অস্বস্তি হয়, আমার ধারণা সকলেরই হয় । পঙক্তিটি এমন : করুণ শঙ্খের মতো স্তন । এর কারণ, আমি পেট্রিয়ার্কি-মেট্রিয়ার্কির লোক নয়, এই-আর-কিই লোক । তা না হলে, মাল্যবান পড়ার পরও বিয়ে করতে অসুবিধে বোধ করতুম, কিন্তু করিনি । তখনও সুতীর্থ পড়িনি ।

অর্থাৎ জীবনানন্দকে নিয়ে যেমনই হোক না কেন, ৮০-৮২ পর্যন্ত একরকম নিরাপদেই ছিলুম আমরা, এমনকি সুতীর্থ পর্যন্ত । বিপদটা বাধল জলপাইহাটি থেকে, যেটাতে পরিষ্কার হল যে জীবনানন্দ শুধু কবিতার আর একরকম মোক্ষ মোক্ষণের কারণে গল্পে-খানিক ভর দেওয়া গদ্যগুলি লিখছিলেন না । তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিল উড়ছে এ সব গদ্যে, আর, আমরা বুঝতে পারছি এই শহর এই মফসসলের বৃত্তান্ত তেমন কিছু পালটায়নি পঞ্চান্ন বছরে, শুধু আড়ালটা একটু কমেছে এবং সে আড়াল জীবনানন্দ যথাসাধ্য ভেঙে দিতে চাইছিলেন । মনে রাখতে হবে, সমসাময়িক দশার কথা লিখবেন না সংকল্প করে, শরদিন্দু একদম অন্যপথে চলে যান ।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ৪৭-৪৮ সালে শরদিন্দুকে লেখা পত্রদ্বয়ে বলেছিলেন, ‘দেশকালপাত্রধরিয়া গল্প লিখিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হয় । কোনটির অসঙ্গত হইলে রসভঙ্গ হয় । গল্প পড়িয়া লেখকের প্রতি ক্রোধ জন্মে’ ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিরোল নদীর ধারে’ গল্পটা পড়ে যোগেশচন্দ্র রুষ্ট হন । এই গল্পে, গ্রীষ্মকালে এক পাগলি নৌকার দাঁড়ে বসে জলে পা ডুবিয়ে দিল । জল পেল কোথায় গ্রীষ্মের দামোদরে ? অন্য পারে পাটখেত । পাট জন্মায়ই না ওখানে–গ্রীষ্মে কথাই নেই । পাগলি তার যুবক ভাইকে নিয়ে যাচ্ছিল, এক বাড়িতে তারা ওঠে, গেরস্ত ভাইবোনকে এক ঘরে শুতে দেয় । অন্তত তখনও, যুবক ভাই যুবতী বোন একসঙ্গে শোয় না । এ ছাড়াও বিভূতির সম্পর্কে অভিযোগ, তিনি অনাবশ্যক দীর্ঘ করেন ।

‘কতো না ঘটনাহীন’বলা হচ্ছে জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসকে, কিন্তু তারা তা নয় এবং হতেও পারে না । অসাধারণ মানবচরিত্র, সাধারণ ঘটনা, অসাধারণ ঘটনা ও সাধারণ কুশীলব, ঘটনা চরিত্র উভয়ই অসাধারণ–এই সংস্থানের বাইরে কোনও গল্প-উপন্যাস যায় না । যথেষ্ট অসাধারণ ঘটনা ও চরিত্রাবলি রয়েছে জীবনানন্দের এই বিশেষ অভিযাত্রিকতায় । কিন্তু, অস্বস্তি, প্রচুর থাকে । আগেই বলেছি যে, পরের ছাপা লেখা থেকে বোঝা যায় মাল্যবান বা সুতীর্থকেও জীবনানন্দ বিশেষ ধরনের কাব্যোপন্যাস করতে চাননি, যা আমরা (আমি) প্রথমে ভেবেছিলুম।

তা হলে বেশ কঠিন জায়গায় আসতে হয় । ‘হিগলে-পিগলে’, উৎপলা মাল্যবানের অগোছালোহয়ে থাকা নিয়ে বলে । ‘৭৫ থেকে বহুদিন বহু বরিশালজদের কাছে সরল জানতে চেয়েছি বা একটু বাঁকা কায়দায় শব্দটা বলে দেখেছি তাঁরা চেনেন কি না । না ।

মনে করিয়ে দিতেই হয় । Higgledy-piggledy বলে একটা শব্দ আছে ইংরাজিতে -উচ্চারণ অবশ্য হিগলে-পিগলে নয়, মানে সেই টপসি-টার্ভি । যা এ ক্ষেত্রে খাটে । সক্রেটিস-জানতিপের কোনও একটা দূরবর্তী আদল উৎপলা-মাল্যবানে আনতে চাওয়া হয়েছিল কি না স্বতন্ত্র প্রশ্ন, কিন্তু লোকমান্য বাস্তবতার হিসেবে দুটো কথা উঠে পড়ে । কোথায় থাকে

এই দু'টি চরিত্র? কলকাতার অপেক্ষাকৃত নির্জনাংশে, ধনী হিসেবে তো থাকে না তারা । উৎপলা বরের মাথার ওপর মেহফিল বসায় আর পাড়ার লোক–মানে সেই ১৯৪০-৪৯ এর লোকজন ছেড়ে দেয়? ওর অনেক কম চেঁচালে তার পরের দশকেও পাড়া ছাড়তে হত । ৪০-৪৯-এর বালিগঞ্জের কেলিকুঞ্জের ফল লেখকের মনে ধরেছে; আবার কলকাতার ঘিঞ্জি বাসাড়েদেরও মনে ধরেছে, একপাত্রে বসিয়ে দিতে গেছেন । উৎপলা মা বা স্ত্রীর রোলমডেল নয় ঠিকই, কিন্তু সিনেমা-থিয়েটারে অসফল গ্ল্যামারণ অভিনেত্রীর রোলমডেল । এবং মাল্যবান ? সে যে সাফাইগুলি দেয় একত্রবাসের তা হল রিরংসার, গৃহশান্তি ও বাইরের সুনামের । চমৎকার গদ্যছন্দ এখানে, কিন্তু সেন্স-গ্রুপের দিকটা শূন্য । অমন বাড়িতে অমন পাড়ায় থেকে বাইরের সুনাম তার থাকতে পারে না । গৃহশান্তির প্রশ্নই নেই, প্রশ্নটা এই নয় যে পত্নী ব্যভিচারিণী, তার থেকে অনেক মারাত্মক - মোটা দাগের ক্ষমতা ছাড়া সে অন্য কিছু চেনে না । এবং কাম ? একটু হেসেই বলতে হয়, পত্নীর যে যৌনসঙ্গিনীত্ব তার আয়ু কতদিন? এবং যে পত্নী পেশিকোষকর্তনকারিণী বা কাসট্রেটিং ওয়াইফ তার গৌরবর্ণ শঙ্খিনী তনিমা আত্মায়-মনে বলাৎকৃত পুরুষটিকে কামী করে তুলেছে দিনের পর দিন–এটা হতে পারে, সেই ক্ষেত্রেই, যখন পুরুষটির ইরেকটাইল ইমপোটেন্স দেখা দিয়েছে । শীতরাতের ঘন হওয়ার যে সব বর্ণনা করেন জীবনানন্দ তা বয়োগত কেরানিকুলের আলোচনার সঙ্গে মিলে যায় নিদারুণ, কিন্তু চটাস চটাস করে সত্য-বলা জীবনানন্দ এই জায়গা পর্যন্ত আসেন না যে মাল্যবানের ওই ইরেকটাইল ইমপোটেন্স অবধি অবস্থা এসেছিল কি না । কন্যা কাময়তে রূপং, ব্যভিচারিণী পত্নীর পতি সাগরে ডুবে মরে ইত্যাদি উড়ো কথায় তাঁর মন বোধ হয় আচ্ছন্ন ছিল । মাল্যবানকেও শেষ পর্যন্ত পড়াশুনো করা ও 'থিঙ্ক'করা এক অসফল রঙ্গজগৎ যশোপ্রার্থীর বেশি কিছু মনে হয় না এখন, তার চিন্তা অনুভূতির বিষয়ে যে সব কাব্যশব্দ তীক্ষ্ণচমৎকার, তা অন্তত তার মাটিতে মানায় না । তাদের নিষ্পৌরুষ দাম্পত্য বাএকত্রবাস এ তো ঠিকই আছে যে মনে হয় যে তা মনোযোগ্যই নয় ।

একটা একটা করে সব উপন্যাস আমি ধরছি না । ওইসব অসঙ্গতি গ্রাম ও শহরের গল্পেও আছে । শচী গ্রামস্থানে সোমেনের দয়িতা ছিল–এমন ইঙ্গিত আছে যে প্রথম তারুণ্যেই তারা দেহবিনিময় করেছিল, তা বেশ, করুক; তারপর শচী কবে শহরে এল, এতদূর কঁতিনতাল সাহিত্যপড়া হল যে সোমেনকে দেখে গ্রোটেস্ক বলে বা গ্রামোফোনের রেকর্ডে আধমরা আরশোলাছেড়ে দিয়ে ফুর্তি পেতে জানে ? একটু নজর করলেই দেখা যাবে উৎপলা শচী নমিতা মণিকা জয়তী সব মেয়ের ভাষাভঙ্গির ধরন এক, সেটা হল, ফিল্ম-থিয়েটারের মহিলাদের খরভাষা ।

এ সন্দেহও আমার ছিল যে, জীবনানন্দের লেখার ভিতরকার বাচিকতা তৎকালীন সিনেমা-থিয়েটারের বহু অভিনেতার বাচিক প্রক্ষেপণে মাখানো-দেশি-বিদেশি দুই-ই - পরে দেখলুম এটাও মিলেছে, অভিনয়কে বিরাট শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি - তার সতীর্থ অগ্রজরা অনেকেই । স অভিনীয়তে–সে প্রসঙ্গে আর যেতে চাই না, মনে পড়ছে কবি শঙ্খ ঘোষও একদিন আমাকে বলেছিলেন, মনে মনে নানা স্বরভঙ্গিতে অভিনয় করতে ভাল লাগে তাঁর । অভিনয়ের এই বোধ বা অঙ্কন থেকে নানা মালমশলা হাতানো-লেখকদের যা কাজ, উত্তরপঞ্চাশদশক লেখকদের মধ্যে বিলক্ষণ কমে গিয়েছে । সেটা এঁদের সভা-টভায় বালক-নাবালকবৎ উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারি, অন্য জিনিস থেকেও । কিন্তু, জীবনানন্দ এই পরিধি গেকে সুফল কুফল দুটোই পেয়েছেন । অভিনয়ে উপপত্তিগত বিরোধের প্রশ্ন থাকে না, লেখকমনস্বিতার ক্ষেত্রে থাকে । মাল্যবানকে খানিকটা আত্মচরিত্র করলে, মানে যে অপ্রেমে অশ্রদ্ধায় কামনায় নিরাপত্তাবোধে উৎপলার মতো ক্ষমতাগৃধিনীকে আঁকড়ে ধরে, সে আর কারুবাসনায় লিখতে পারে না 'সমস্ত কারুতান্ত্রিকই কি সংসারের স্ত্রীর প্রতি এমন বিরাটভাবে উদাসীন থাকে'?এ তো দেখা যাচ্ছে মহা

মুশকিল–কেবলই সহানুভূতি চাওয়া হচ্ছে, একবার মজবুরি দেখিয়ে, অন্যবার শিল্পসমর্পিত পুরুষের ঔদাসীন্য দেখিয়ে । একইরকম উপপত্তিগত বিরোধ হয় যখন জীবনানন্দসোমেন বলে, 'আমার ভিতর বিশেষ কোনো নীতিপ্রখরতা নেই; আমি জিনিসকে ভালোবাসি আমি জিনিসকে ঘৃণা করি–এই শুধু - '

নিজে অরবিন্দ গুহকে বলছেন, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না । মানুষের নীতিবোধে বিশ্বাস করি ।

আর খুব বেশি লিখতে চাইছি না । টমাস মান তো পড়তেন জীবনানন্দ, কিন্তু তাঁর গল্প উপন্যাস সবসময় চতুরঙ্গ শেষের কবিতা গোরা ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে দেয় কেন প্রচ্ছন্নে ? শরদিন্দু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'দুঃখের একটা সূত্র তাহাকে ধরাইয়া দিলে তাহার লেখনী সেই সূত্র ধরিয়া চলিবে, এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়া পৌঁছিবে তাহার স্থিরতা নাই । শিল্পবুদ্ধির দ্বারা সযত্নে গঠিত নিটোল নিখুঁত একটি রচনা তাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না' । পথের পাঁচালী ও আরণ্যককে বাদ দিয়ে বলছেন । বিভূতিভূষণের তিরোধানের পর শরদিন্দু ডায়েরিতে লিখেছেন, "আমি তাহার সাহিত্যবুদ্ধি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার নিজের মুখের কথাই তাহা সমর্থন করিতেছে । সে conscious artist ছিল না । 'একদিন নিভৃতে বিভূতি বলল–দাদা, আমি কিছুই ভেবে লিখি না । লেখার সময় মনে যা আসে তাই লিখে যাই" -

'দুঃখ' পালটে নিয়ে নৈষ্ঠুর্য শব্দটাকে বসালে, জীবনানন্দের গল্প উপন্যাসকে ধরা যাবে । অতি অসাধারণ দ্রুততায় তিনি এইসব লিখেছেন, যে লোক কবিতা প্রবন্ধ চিঠিপত্রে একেবারেই অন্যরকম, যথেষ্ট সময় নিতেন । মুশকিল এই যে কবিতা প্রবন্ধ চিঠিপত্র যথেষ্ট উদ্ধত শিল্প, কিন্তু গল্প-উপন্যাস তা নয় । লীলা মজুমদার বলেছিলেন, কবিদের একটা আলাদা উগ্রতা গাকে । জীবনানন্দ উগ্রতম বললে কিছু ভুল বলা হয় না । কিন্তু ওই অবশ্যধার্য লক্ষণটি গল্পে উপন্যাসে কোনও কাজে লাগে না যদি সে জিনিসকে সত্যিই কোনও কারুকৃতি দেওয়ার ইচ্ছে থাকে । জীবনানন্দের গল্পে উপন্যাসে প্রথম থেকেই একটা জেদ/অহঙ্কার দেখা যায় যে, তিনি যেন বলছেন, পাঠক, দেখ, আমি কিন্তু গোল মসৃণ গল্প লিখি না । প্রথম থেকেই নিজেকে এই নেগেটিভ ভোটটা দেওয়ার জন্যে, তাঁর গল্প উপন্যাস শজারুর ধাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল ও বাঘিনীর থাবার এক সমাহার হয়ে ওঠে, যা আত্মধর্ষকামী (মর্ষকামী) পাঠকের ক্বচিৎ উপভোগের সামগ্রী হয়ে যায়, তিনি গল্পে উপন্যাসেও এক ভীরু প্রবন্ধলেখকই থেকে যান–এই অভিযোগ তুলছি এই জেনেই যে এ সবের অনেক পরিসরই কবিতা বা কবিতার বিশেষ বহুগুণান্বিত মিত্র, এই বৃত্তে তিনি ট্রিগারহ্যাপি মিলিটারি হলেও ।

আর একটু । অন্য চমক পেয়েছি তাঁর ডায়েরিতে ।

A rural girl তো বটেই, জীবনানন্দের 'কারু'শব্দটা ভাবা দরকার: ভাবা দরকার কারকিত শব্দটা–চাষবাসের ব্যাপার যা - কারুকৃতি থেকে আসে । বিদেশে যেতে ভালোবাসেন না তিনি -'বাংলাকে সে এমন গভীরভাবে চেনে, এমন রোমহর্ষে কাঁটা খেয়ে ভালোবাসে' । উলটো পিঠে, 'কত মেয়ে চষেছে নিজেই অসিতের কাছে সে সব গল্প অনেকবার' -

ব্রাহ্মসংস্কৃতি তাঁর কাছে আত্মাহীন নিরনুভব জীবনোত্তাপবর্জিত মনে হয়েছে ।

না, ইজিপশিয়ান অর মোয়াবাইট অর সোডোমাইট অর ব্যাবিলনিয়ান চ্যান্টস-এও আশ্চর্য হইনি । 'ডেলহি'অ্যান্ড আপকান্ট্রি রিফ্লেকশনস উইথ বিগ অফিশিয়াল পোস্ট, আপকান্ট্রি ভিরাইল ব্রাহমিন কুকস –এই জায়গাটা দেখেই, সবথেকে ঘাবড়ে গিয়েছি । অন্য একটি লেখায়, তাঁর উভকামিতার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তখন এত স্পষ্ট ছবিলা বর্ণনা পাইনি ।

এখন আবার চোখ পড়ছে তাঁর এক বাক্যে, 'আমার সৃষ্টিপদ্ধতি সূর্য ও তপতীকে আশ্রয় করে, হয়তো তপতীকেই অবলম্বন করেছি বেশি–কোনো এক ভবিষ্যতে বিশেষ করে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য' -

সন্দেহ কি যে সামাজিক অবদমনের মধ্যে থেকে গুড কনডাক্টের প্রাইজটাকে জীবনানন্দ কবিতা প্রবন্ধ পত্রে হয়তো খারিজ করতে পেরেছিলেন অনেকটাই, কিন্তু এমন কোনও ব্যক্তিগত কৌশল খুঁজে পাননি যাতে তাঁর অতিব্যক্তিক স্ফূর্তি তিনি খুঁজে পান । সুতরাং গল্প উপন্যাসের অনন্ত কুয়োর মধ্যে বিষাদসিন্ধুর হানিফার মতো তাঁর একটানা অশ্বক্ষুরধ্বনি আক্রোশে অভিশপ্ততায় যেমন উজ্জ্বল তেমনই নিস্ফল! ক্যাপাসিটি অব টেকিং ইনফিনাইট পেইন প্রতিভার এক সর্বমান্যলক্ষণ, দুর্মরযোনিত্ব বা Genius-এর লক্ষণ- জীবনানন্দের যে সে জিনিস ব্রহ্মচর্যজাত (খাঁটিঅর্থে) এ নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই, কিন্তু কোনও শিল্পীর পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজন যে যৌনসম্ভোগ যা তাঁর চিত্তশুদ্ধি ঘটায়, তা তিনি পাননি, পেলে হয়তো বাংলা গল্প উপন্যাসে রূপকথার কিরণমালা নেমে আসত ।

আমার চার দশকের জীবনানন্দ এরকমই । এক সময় আমার ভিতরের আকাশের সব তারাদীপ জ্বালিয়ে তার লেখা পড়েছি আমি । সেই বিকেল, সন্ধ্যা ও শেষরাতেও শেষ হয়েছে বুঝতে পারছি । হতে পারে যে যেমনই হোক আমিও একরকম লেখক, আমার দৈবই এক জায়গায় তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার–সে যুক্তিতে হোক, অযুক্তিতে হোক ।

বৈদগ্ধ্য

অক্টোবর **১৯৯৯**

সম্পাদক: শেখর বসুরায়

অতিথি সম্পাদক: ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ ধর

মিথ্যার জবাবে
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে "দেশ " পত্রিকার ২৭ তারিখের সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় (ওদের সঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন কেন কে জানে!) বাংলা কবিতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জানান যে, বাংলা ভাষায় এত কবি কেন? এটা তারা বুঝতে পারছেন না এবং এই সব কবিদের অধিকাংশের কোনও ছন্দজ্ঞান নেই। সুনীল-শক্তির বাংলা কবিতা নিয়ে এই মাতব্বরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় 'পূনর্বসু'র (বসন্ত, ১৩৯৪) সংখ্যায়, সেটি ছিল দ্বিতীয় সংখ্যা । আমরা বুঝেছিলাম যে, বাংলাভাষায় কবিদের উত্তরআধুনিক বিস্ফারকে সুনীল-শক্তির পক্ষে তাদের কৃত্তিবাসীয় আধুনিকতা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয় । প্রসূন বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় ছাড়া চিঠি ও প্রবন্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন কালীকৃষ্ণ গুহ, রণজিৎ দাশ, তুষার চৌধুরি ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল । পার্থপ্রতিম তাঁর প্রবন্ধে (মিথ্যার জবাবে) শক্তির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে, ছন্দজ্ঞান শক্তিরও নেই । পার্থর লেখাটি ছিল সবচেয়ে অ্যাগ্রেসিভ । সুরজিৎ সেন

'কবি না হলেও, একজন কারিগর তো হয়েছি । ' শক্তি চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ২৭/২/৮৮'র দেশ পত্রিকায়, শীর্ষেন্দু ও সুনীল-সহ কথোপকথনছলে । কারিগর বলতে যদি যে সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠানে তার আপিশ, তার কারিগর বোঝায়, তাহলে আলাদা কথা । কিন্তু যদি কবিতার কারিগর বলতে চান তিনি নিজেকে, তাহলে, আমি মাত্র তিনটি উদ্ধৃতি দেবো:

১ । বাবার হাতে তৈরি আমি, এক মুহূর্তে ভাঙবো পিঠের
উল্টে-রাখা সাধের সিন্দুক - মোহর মেজেয় পড়বে ঝরে
নীল জলে লাল পাথরকুচি আষ্টেপৃষ্টে আলিবাবার
আমি একটি সোনার মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে
স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো- আমি সিন্দুকে সাঁতার কাটছি ।

পাখি আমার একলা পাখি/পৃষ্ঠা ১৫ ।

২ । তাই নিয়ে কি হয় না মিছে
দিনদুপুরে এই যে হাঁটা - সব তো সমতল-পিরিচে
রেখেই আসছে, সঙ্গে নিলে
সামান্য কি যথাসর্বস্ব?

আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষা/পৃষ্ঠা, ২৩ ।

৩ । হেঁটোয় কাঁটা--ওপারে কাঁটা, এই কি দীর্ঘ জীবনযাপন?
এই কি রোমাঞ্চকর যামিনী, হায় মাছি তুই সোনার বরণ ।

খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো ব'লে একা-একাই
দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবোই,
....
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি
এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী - সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না । পৃষ্ঠা ২৪ ।

একা-একাই ... পাড়ি দেবোই অবশ্য কোনো ছন্দভুল নয়, তেরো বছরের বালক পর্যন্ত এই ই-ই লিখনরীতি মার্জনীয় । এ বয়স পেরোলে নয় । যে বইতে এসব রয়েছে তা হলো শক্তির 'সোনার মাছি খুন করেছি' । ৬৭-র জুনে, তার তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সে, প্রকাশিত । এই গ্রন্থের খ্যাতির কথা কারোরই অজানা নয় । গত ২১ বছরে, স্বকথিত এই কারিগর স্বরবৃত্ত ছন্দ লিখতে গিয়ে কৃত এই অপকর্মগুলির একটিও সংশোধন করে উঠতে পারেননি তার সমস্ত দ্রুতছন্দের লেখায় এহেন বিপর্যয় ঘটেছে - একথা বলছি না । এমন কি, ঐ স্বরবৃত্ত লেখার সময়, সূর্যদেব চ/লে পশ্চিমে - জাতীয় মধ্যখগুন তার লেখায় বহু পরিমাণে পাওয়া গেলেও, আমরা সস্নেহেই দেখে থাকি ।

একদল চতুর বলবেন, শক্তি ছন্দ ভেঙেছেন । স্পষ্ট বলা দরকার যে ছন্দ-ভাঙার কথা আলাদা, সেখানে ছন্দের এমন কাপড়ে-চোপড়ে হয় না । দৃষ্টান্ত:

সুতপা   সারা দেশগাঁ/ জুড়ে মধুবরিষণ
সেনগুপ্ত   ভিজেছি নীলাম্বরী
                ভালোবাসি, তাই/ শান্ত থাকতে পারি

তিন+তিন-এর যে মাত্রাবৃত্ত, তার সাধারণ অঙ্ক-গণনার সারা দেশগাঁ একমাত্রা কম । মজা এই যে এই অঙ্কের বোধ পাঠকের কখনই আসবে না; একেই বলে ছন্দ-ভাঙা, ছন্দের ব্যাকরণকে পুরো নিজের হাতে নেওয়া । না হলে ছন্দ এভাবেই ধেনে-কেটে ধিড়িংগেটড়ে ওঠে - স্বয়ংকথিত কারিগরের হাতে যা হয়েছে ।

নমুনাটি বিশেষ করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য দেওয়া হলো; কেননা, সুনীল, ১৯৮৪ সালে দেশ পত্রিকায় একটি তিন+তিনের মাত্রাবৃত্ত লিখতে গিয়ে একটি পংক্তি লেখেনঃ 'আমার হলো না যাওয়া, যাওয়া হলো না, হলো না যাওয়া ।' দুই যাওয়া ও দুই হলো নার মধ্যে, না, কোনো inner space নেই । দেশগাঁর শেষ আকারকে একমাত্রা প্রস্বর হিসেবে টানা যায় - গ ব্যঞ্জনবর্ণ ব'লে; 'যাওয়া' শব্দটা কঠিনভাবে দুমাত্রা ওজন, যাওয়াকে আর টানা যায় না, সুনীল ! ছন্দ তো আর কবিতার মতো সাবজেকটিভ, অর্থাৎ, বড়াসাবমুখাপেক্ষী নয় । এবং, এই সুতপা সেনগুপ্ত ১৯৭৯-এই লেখেন 'রোহিত' নামে একটি কবিতা, তখন তাঁর বয়স ১৬/১৭ - সেই কবিতাটি প্রফেশনপ্রিয় সুনীলের প্রফেশনের স্বার্থেই, পড়ে দেখা উচিত। কুমীরকুমারীর দ্রুত বিন্যাস যাঁরা ঘটান তাঁদের পিঠ চাপড়ে কোনো লাভ নেই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন ধ'রেই নানা উষ্মাজড়িত শ্লেষ বা শ্লেষ্মার উদ্‌গার করছেন নবীনবয়সী কবি ও কবয়িত্রীদের দিকে । এছাড়া তার উপায় নেই, আমরা বুঝি । পানাসক্তি চাইবাসা জনৈক চিত্রতারা প্রভৃতি নানা উপায়ে দীর্ঘদিন তিনি 'স্টোরি' হয়ে

এসেছেন এবং সেই সুবাদে ৬৭ সাল থেকেই প্রধানতম কবি হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছেন । এখন বয়স হয়েছে; এই পথগুলি আর প্রশস্ত নয় দেখে এই পথ নিয়েছেন । তার নিজের নাম শুনেই যে চট করে বোঝা যায় না তিনি মহিলা না পুরুষ--এই ধারণাই তার হয়নি। ইদানীং গদ্য পদ্যে তিনি বলে যাচ্ছেন কবিতা লিখে শুধু তারই কিছু হয়েছে, বাকিদের কিস্যু হয়নি । এমন দখ্নে-ইতরতা, বাংলা সাহিত্যে আগে আমরা দেখিনি । অমুক ছন্দ জানে না, তমুক ছন্দ ভুল করে । হে প্রাক্তন কবি, এসব বলতে গেলে, সাবুদ দেখিয়ে বলতে হয় । এতো কবি কেন? শক্তির প্রশ্ন । আমার উত্তর, তিনিও কবি পরিচয় পাচ্ছেন বলেই বাকিদের সাহস হয়েছে ।

যাই হোক, এই কথোপকথনে অন্য কোনো বিষয়েই এঁরা আলাপ চালাতে পারলেন না, অনবরত ছন্দের কথা হতে থাকল । সুনীল চালাকের মতো বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে শক্তি ছন্দের ব্যাপারে খুব রিজিড । বস্তু যে কি, প্রথমেই দেখিয়েছি ।

কোন্ছন্দ? পয়ার, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত - এগুলোকে বাঁধা-ছন্দের মধ্যেই ধরা হয় । গদ্যও এক ছন্দ - যে ছন্দে শক্তির ব্যর্থতা সকলেই দেখেছেন । ছয় ও সাতের দশকে, বাঁধা-ছন্দে, লেখা হয়নি? সব গদ্যে লেখা হয়েছিল? এঁদের এই তথ্যবিকৃতিতে প্রথম উৎসাহ জুটিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ, "সত্য" শব্দটি ছাপতে যিনি বড় বেশি ভালোবাসেন - ১৯৬৬-র শেষে কৃত্তিবাসে ছন্দোহীন সাম্প্রতিক লিখে । এ ১৯৬৬-র গ্রীষ্মে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা'য়, যার সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৮/১৯ বয়স্ক অমিতাভ গুপ্ত লিখেছিলেন 'মন্দিরে' নামী কবিতা সমিল তিন+দুই-দুই-এর মাত্রাবৃত্তে, একই সময়ে প্রকাশিত কৃত্তিবাসে গৌতম মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'উদাসী সন্ন্যাসী', পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে । তখন তার বয়স ১৭ । এগুলি দেখেননি শক্তি-সুনীল-শঙ্খ ? অন্য পত্রিকা না-ও দেখতে পারেন ধ'রে নিচ্ছি । সামসুল হক, গীতা চট্টোপাধ্যায়, শংকর দে, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, করুণাসিন্ধু দে, তুষার রায়, সুব্রত চক্রবর্তী, চিন্ময় গুহঠাকুরতা এঁরা ১৯৬৫-র আগে থেকে লিখেছেন, প্রত্যেকেই বাঁধা ছন্দে মূর্খভ্রম ব্যতীত ঠিকঠাক লিখেছেন । দেবারতি মিত্র ৭১ সালে গল্পকবিতায় স্বরবৃত্তে অতি চমৎকার লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন । ভাস্করকে হয়তো ৭ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনো তালপ্রধান ছন্দে লিখতে দেখা যায়নি, কিন্তু এই সময় পর্যন্ত তার অক্ষয়বৃত্ত ছন্দের সুষমা কে ভুলবে? সত্তরের কিছু আগে অরুণ বসু, রণজিৎ পাল ও নিশীথ ভড়, সত্তরের প্রথমে তুষার, শ্যামলকান্তি, বীতশোক, মৃদুল সত্তরের মাঝামাঝি গৌতম চৌধুরী, কাঞ্চনকুন্তলা, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ লাহিড়ী - অনেকেই ছন্দে লিখেছেন, হতে পারে যে অন্য কেউ কেউ স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত বা সংস্কৃতানুগ ছন্দ, যেগুলিকে আমি 'তালপ্রধান' বলছি, তেমন পছন্দ করেননি । সুতরাং, আটের দশকের নবীনরা ছন্দ নিয়ে বেশি যত্ন করছেন, এই তথ্যবিকৃতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোন স্পর্ধায় করছেন? একটু বাদে তিনি তাল সামলাবার জন্য বলছেন, অনেককে জানি ছন্দ খুব ভালো জানে, কিন্তু কবিতা হয় না । 'কবিতা হয় না' - কথাটার হেডপণ্ডিতির কথা বাদ দিচ্ছি, ধরে নিচ্ছি, তার ভাল লাগে না । তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ছন্দোষত্বের ইতিহাস জয়, মল্লিকা, সুবোধের একমাত্র প্রাপ্য নয় । প্রথমত, জয় ও সুবোধ সাত দশকের মাঝামাঝি থেকেই লিখছেন : সুবোধের এই তালপ্রধান ছন্দ নিয়ে যত্ন বছর তিন-মাত্র হলো । শঙ্খর সঙ্গে 'ছন্দোহীন সাম্প্রতিক' নিয়ে আমার কথা হয়েছিল, তিনি মৃদুকণ্ঠে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন, পরে 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় 'ছন্দোপকথন' (৮৪ সালে) পড়ে বুঝি যে যে কোনো মূল্যে তিনি কয়েকটি নামকে তমসাবৃত রাখতে চান । না হলে, যে নামগুলি অন্তত ব্যতিক্রম হিসেবেও ছন্দোহীন সাম্প্রতিকে তার রাখা উচিত ছিলো, সেগুলি এই দ্বিতীয় সুযোগেও বলা হয়নি কেন?

পাঠকের জন্য এবার আরো একটি লেখাঃ

স্বর্ণময়ী পুকুরের কথা

গ্রীষ্মশেষের/ প্রথম যেদিন/ চাঁদ দেখা যেতো
গ্রহানন্তরের/ নভঃচরদল/ নামতো যখন
স্নান সেরে ঘাটে/ অন্তর্বাস/ ফেলে রেখে যেতো

এখানে বুড়োরা/ খোঁজে মাটি খুঁড়ে/ - হাতে লণ্ঠন
নামে কামপরী,/ শিল্প শিথিল,/ উর্ধরেতঃ
ওই কৌপীন/ পরে ডুব দিলে/ - পুনর্যৌবন ।

লেখিকা মল্লিকা সেনগুপ্ত । 'কবিতাপত্র সংবর্ত' ৮৫-র মে-আগস্ট সংখ্যায় ছাপা । কোনো ছাপার ভুল নেই এটা এই কারণেই বলতে পারি যে, বন্ধুজনের পত্রিকা হিসাবে আমিই প্রুফ দেখেছিলাম, এবং মল্লিকা কোনো সংশোধনী পাঠান কিনা - এর জন্যে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করা হয়েছিলো । এই নয় যে, এই প্রকার গোদা ভুল তার লেখায় আরো দেখেছি অনেক । ইদানীং তিনি ছয় ও সাতমাত্রার লেখা রচনায় মন দিয়েছেন - যার দ্রুত প্যারোডিযোগ্যতা অভিমান ২৫-এ দেখিয়েছেন প্রসূন বন্দোপাধ্যায় প্রসূন অবশ্য 'পুচ্ছ মম/ উচ্চে তুলে/ গুচ্ছ লিখে/ চলি মূহামানে/ উহ্য রহো,/ গুহা নাহি ল' ধরণের ছন্দ, যে ছন্দে যথেষ্ট লিখেছেন জয় গোস্বামী, নিয়ে কোনো কথা বলেননি । যাই হোক, মল্লিকাকে ছন্দের ব্যাপারে অতি সতর্ক যত্নবান বলা যায় না । তবে কি এই কারণেই তাঁদের কীর্তন? ঠিক কোন কারণে, ক্ষৌরকারসুলভ ছন্দোনৈপুণ্য, না ভুল ও কুৎসিত ছন্দে অন্তত একটিও লেখা ছাপানোর কারণে?

শঙ্খ, শক্তি, সুনীল, জয় ও মল্লিকা - যে পাঁচজনকে এখানে বাধ্যত আক্রমণ করা হলো, এঁদের লেখা-শৈলী এবং কিছু লেখা, যে প্রথম তিনজনের ক্ষেত্রে অতীতেই হোক এবং পরবর্তী দুজনের ক্ষেত্রে সমসাময়িকই হোক, আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছে । এঁদের সম্পূর্ণ অলেখক মনে করলে একটি শব্দও কাগজে কলমে করার কোনো উৎসাহ আমি পেতাম না । আমার বক্তব্য, যাওয়া, হাওয়া, খাওয়া - এসব শব্দকে কোনো ছন্দসূত্রেই তিনমাত্রা ধরার স্বাধীনতা বাংলা ভাষার কোনো কবির নেই; গদ্যছন্দকে ছন্দ নয় বলার মতো মূঢ়তা, কোনো কবির থাকার কথা নয় । নভঃচরদল, যা নভোচরদল করা যায় বা পুনর্যৌবন, যাকে 'ফের যৌবন' করা যায়, এই কি রোমাঞ্চকর যামিনী যা সহজেই এই কি রোমাঞ্চের যামিনী হতে পারে, যথাসর্বস্ব, যা যথাসমূহ বা যথাসকল হলেই ছন্দের কান অক্ষুণ্ণ থাকে এইসব সহজেই হতো যদি সত্যিই ছন্দ নিয়ে ঐ যত্ন, থাকতো তাহলে মুর্খের বেসুর লাগতো না । যিনি নিজেকে কারিগর বলে দাবি করছেন তার জানা উচিত যে উল্টে রাখা সাধের সিন্দুককে উল্টোনো সাধের সিন্দুক করে তিনি নিজেরই পিঠ বাঁচাতে পারতেন কায়ক্লেশে, 'আমি সিন্দুকে'র বদলে 'সিন্দুকে আমি' করলেও তা নিয়ে অন্তত এই প্রশ্ন তোলা যেত না । কোনো কবির ছন্দভুল তখনি ক্ষমা করা যায় যখন তা কানে বাজে না, অথবা এমন একটি মোক্ষম শব্দ এই ছন্দভুলের জন্য দায়ী যার এতটুকু হেরফেরে কবিতাটির নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে । কিন্তু শক্তি, মল্লিকা এবং জয়ের এইসবও কোনো কোনো লেখায় ব্যক্তিমন প্রথম থেকেই ধরা পড়ে - তারা তালপ্রধান ছন্দ লিখছেন

এইটা দেখাচ্ছেন । তা-ও সই, কিন্তু সেটা ভালোভাবে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে, চট করে প্যারডি না হয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে, লেখা দরকার ।

আমার নিজের একটু ছোটো পরিচয় দেওয়া দরকার খবর কাগজে রাঘব, পিনাকেশ প্রভৃতি কাব্যসমালোচকরা লেখেন যে ছন্দমিলের খেলা ব্যতীত আমার বিশেষ কোনো সম্বল নেই । ১৯৬৬ সাল থেকে, যাকে ছন্দ বলে, এ জাতীয় লেখা আমি লিখে আসছি । অর্থাৎ জয় মল্লিকা বা আরো কেউ ছন্দে লিখলে ফলাফল একরকম, আমরা লিখলে অন্য, কেননা, জয় মল্লিকার 'কবিতা' উচ্চপদস্থ সাহিত্যজীবীদের চোখে পড়েছে । বেশ, তাহলে সেই কবিতার কথা কোথায় গেল ?

ছন্দোগত ইতিহাসের এই তথ্যবিকৃতি অর্থাৎ আক্রমণের উদ্দেশ্য অনেক । প্রথম কারণই হলো, জিনিসটা যদিও অবজেকটিভ, বাংলার ছান্দসিকেরা কিন্তু প্রাঞ্জল পরিভাষা এখনো উপহার দিতে পারেননি । বাংলা অনার্সে ছন্দ পাঠ্য এবং ধার্য নম্বরও খুব বেশি নয় । বাংলায় এম-এ করা বহু ছাত্র এবং দুই তরুণ কবিকে আমি দেখেছি যে তালপ্রধান ছন্দের কান তাদের নেই । কথা বলতে গেলে স্বরবর্ণে চাপ দিয়ে স্বস্তি বোধ করেন এমন লোকদের তালপ্রধান ছন্দের কান থাকেও না ।

এবার, অ্যাকাডেমিক অ্যাপ্রোচের দিক থেকে ছন্দ বোঝেন এমন কবিদের সংখ্যাও বেশ কম । জানলেও সেকথা অনেকে বলতে চান না- ও, তুই তাহলে ছন্দগুণে কবি - এই কথা শোনার ভয়ে । এই ভয় যাট শেষ ও সত্তর প্রথমার্ধে বেশ ভালেই ছিলো, যদিও ছন্দে লেখা হতোই, আর কিছু না হোক, শক্তির লোকরঞ্জনী তালপ্রধান ছন্দের কারণে । আনুপাতিক হিসেবে বাঁধাছন্দে লেখার আগ্রহ সত্তরের শেষ থেকে বেড়েছে, কারণ, সুস্থিতি হোক বা বিশ্বাসহীনতা কোনো একটি সূত্র রাজনৈতিক দিক থেকে এক প্রত্যাশাহীনতাই পশ্চিমবাংলার এই আট দশকের চরিত্র । যদিও, তাতে, ছন্দোনৈপুণ্যের প্রসঙ্গ একেবারেই অবান্তর ।

বাঁধাছন্দ সত্যিই কবিতার পক্ষে দরকারী কি? জবাব সোজা--কোনো কোনো কবির কোনো কোনো কবিতার পক্ষে দরকার কিন্তু কবি হতে চাওয়া এবং কবিতা না পড়তে চাওয়া বাঙালির (যার নমুনা শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজে, এ কথোপকথনে যিনি কবুল করেছেন যে, 'আগে পড়তাম না, আজকাল পড়ছি' - এবং এই ভিত্তিতেই ছয়-সাত সব খারিজ) কাছে দুর্মর কুসংস্কার হলো যে, কবিতায় ছন্দ নেই ? সে তো ভাবতেও পারি না । শক্তি সুনীল ইতস্তত ভ্রমণপূর্বক কবিতাপাঠ করে এইটা বুঝেছেন যে অন্য জটিল আপত্তির বদলে ছন্দোহীনতার অভিযোগই সোজা ছয়-সাত দশকের ছোটো পত্রিকার অরণ্য কে ঘাঁটতে যাবে - এমন কি তাঁদেরই সম্পাদিত সংকলনে কি আছে কে দেখবে - যদিও দেখলেই বোঝা যাবে, শতকরা

একশো ভাগ মিথ্যাকথা ছাড়া আর কিছুই তারা বলছেন না । কোন্ধরণের ছন্দ যাট সত্তরে লেখা হয়নি, যা এখন লিখছেন জয় মল্লিকা সুবোধ ? আবার বলছি, এসব বললে, সাবুদ দেখিয়ে, বলতে হয় - যা তারা ভালই জানেন যে তাদের হাতে নেই । জনপ্রিয়তা ভিক্ষায় যাঁরা দুটি লেখা ব্যতীত অন্য লেখা পড়তে পারেন না, একুশ বছরেও গোদা ছন্দপতন সামলাতে পারেন না, তারা কবিতাদেশ নিয়ে কথা বলার আগে পশ্চাদ্দেশ সামলান দয়া করে । সুনীল তো মাঝে মাঝে ইনিড স্টার্কি, ওর্ভিদ প্রভৃতি নানারকম নাম বলেন, কাফকা সাঁটে লিখতেন বলে বিক্রম প্রকাশ করে থাকেন - স্নেহধন্য কবিদের প্রধান কবি বানাবার জন্য, হায়, ছন্দের থেকে সূক্ষ্ম অছিলা কিছু খুঁজে পেলেন না তিনিও ।

লেখা অনেক বড় হয়ে গেছে; অমিতাভ গুপ্ত ও গৌতম মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুটির উদ্ধৃতি আর দিলাম না - এগুলি লুপ্তও হয়নি । আর দুটি তথ্য দাখিল করতে চাই । ১৯৭৯-এর ১৭ জুলাই রেডিওতে এক ২০ মিনিটের প্রোগ্রামে তরুণ কবিদের তালপ্রধান

ছন্দের কবিতার কিছু নমুনা আমি শোনাই । তাড়াহুড়োয় ও ছোটো সময়ের কারণে অনেকেরই উল্লেখ হয়নি । যে ১৫ জনের কবিতা আমি সেদিন পড়ে শোনাই তারা হলেন অমিতাভ গুপ্ত, রণজিৎ দাশ, অনির্বাণ লাহিড়ী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল দাশগুপ্ত, সোমক দাস, জয় গোস্বামী, বীতশোক ভট্টাচার্য, স্বরাজ সিংহ, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, গৌতম মুখোপাধ্যায়, গৌতম চৌধুরী, নিশীথ ভড়, শ্যামলকান্তি দাশ, সন্দীপ মুখোপাধ্যায় । কিছুদিন বাদে জানতে পারি, ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেই সেই কথিকা শুনেছেন এবং কবিতা সিংহকে স্বতঃপ্রবত্ত হয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন কবিতা সিংহ আমাকে সেই
চিঠি রিডাইরেক্ট করে পাঠান । এ চিঠির জবাবে প্রবোধচন্দ্র সেনকে আমি আর একটা চিঠি পাঠাই - সবটাই কৃতজ্ঞতার কারণে নয়, একটু মজা লাগছিল এই ভেবে যে স্বরাজ সিংহের লেখাটিতে একটি লাইসেন্স নেওয়া ছিলো, তা প্রবোধবাবুর কান এড়িয়ে গিয়েছে । সেটা স্পষ্ট উল্লেখ করিনি; ১৬.৮.১৯৭৯-এর দ্বিতীয় চিঠিতে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখছেন:
'অনেক আধুনিক কবিদের ছন্দোদৈন্য দেখে বড়ই হতাশ হই । এই ছন্দোহীনতা সব সময় ইচ্ছাকৃত নয়, অনেক সময়ই অজ্ঞতা ও অক্ষমতাজাত । এই অবস্থায় সেদিন রেডিওতে এতগুলি তরুণ কবির ছন্দোনিষ্ঠা ও ছন্দোনৈপুণ্য দেখে অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেয়েছি । আরও আনন্দ পেয়েছি পরিচালনার দক্ষতা ও ব্যাখ্যা শুনে । তাতে মনে আশার সঞ্চার হয়েছে । পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে নিখুঁত সুন্দর ছন্দের সাক্ষাৎ পাই । ভাল লাগে। কিন্তু হঠাৎ কোনো ভালো ছন্দোময় কবিতা পড়ে আনন্দ হয়, তৃপ্তি হয় না । কিন্তু সেদিন একসঙ্গে এতগুলি তরুণ কবির ছন্দোনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া একটা দুর্লভ রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পাবার মতোই বা সবিস্ময় সৌভাগ্য লাভের মতো প্রীতিকর । সে কথাটা জানিয়েছিলাম শ্রীমতী কবিতা সিংহকে ।
যা হক, সেদিনের উৎসাহী পরিচালকের সঙ্গে যে এভাবে আমার যোগাযোগ হয়ে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি । যোগাযোগ হখন হল তখন সেটা রক্ষাই কাম্য । আপনি ছন্দোময় রচনার 'বেশ কিছু নমুনা' আমাকে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন । এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কি হতে পারে? এগুলি তো আমার কাজেও লেগে যেতে পারে । আমার বই-এ প্রয়োজন মতো তার থেকে কিছু দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করতে পারি, যদি তেমনি যোগ্য সুন্দর রচনা পাই । একবার চলে আসুন না এখানে । সাক্ষাতে আলাপ করার আগ্রহ বোধ করেছি, সেদিন আপনার মুখে ছন্দের শেণীবিভাগ ও ব্যাখ্যা শুনে' খেয়াল রাখবেন, যে সময় এই দুই চিঠি তখনো আটের দশক শুরু হয়নি । এঁদের উচিত নিঃশর্ত মাফ চাওয়া; বাংলা কবিতা এখনো এতো হিন্দী গানের জগৎ হয়নি যে এইসব লতা-আশাগিরি এখানে চলবে । জনপ্রিয়তা - যে অর্থেই হোক, একসময় এই দুজনেরই ছিলো আমরা জানি; এর ভিত্তিতেই এই বিক্রম । এবং সভাকবিতা, লাইফস্টোরি বা আপিশ লাইব্রেরির উপন্যাস - সব বিভাগেই তাদের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত পড়তির দিকে, কোনো রঙতেল চোবানো সাপ্তাহিক বা ক্যাঙারু-দেশ ফেরৎ বুদ্ধিজীবী-কাম-দুর্গদ্যজীবীর নির্দিষ্ট এক তরুণ কবি ও আর এক তরুণী কবি সেই সোনালি দিনগুলি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না । ৮৮-র শিশিরমঞ্চের কবিতা উৎসবে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট হাততালি অন্য কেউ পেয়েছেন বলেই এই রাগ তথা কবিতা ভাবনা তো? পদ্যবিষয়েও আলোচনায় ব্যক্তিগত বাড়ি-জমির উল্লেখে অভ্যস্ত এই নতুন, বিষম মানসিংহদের আবার জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, 'করোতি/বাসং গিরিরাজদুর্গে/ তথাপি সিংহ পশুরেব নান্যঃ '

পুনর্বসু, ১৯৮৮/মার্চ

দেবী

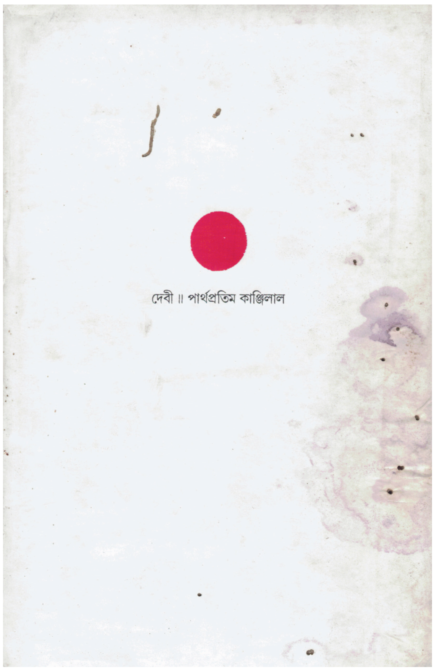
প্রথমে দেবী বেরিয়েছিল অভিজ্ঞান প্রকাশনা থেকে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে । প্রকাশক হিসেবে ছিলেন নিশীথ ভড় । আরো-একটু গল্প : তরণী পত্রিকার সম্পাদক ও কবি দিলীপকুমার বসু আমাকে ও নিশীথকে কিছু টাকা দেন, যাতে অভিজ্ঞান প্রকাশনার জন্ম হয় এবং অমিতাভ গুপ্তের আলো বইটি বার হয় ।

আলো বার হলো অক্টোবরে (১৯৭০), সেই বইয়ের বিক্রয়লব্ধ টাকা সবটাই অমিতাভ গুপ্ত দিলেন দেবী বার করতে । এতে দিলীপকুমার বসুর সম্মতি ছিলো । দেবী বেরিয়েছিল মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস থেকে, সেখানে তখন আমার বাবা ছিলেন ।

সাড়ে তিনদশক বাদে, দেবী বইটি আবার বেরোলো । এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার দ্বিতীয় মুদ্রণের কথা অনেকে তুললেও, লেখকের ব্যক্তিগত অনিচ্ছা ও ব্যস্ততায় বাধা পড়েছে ।

কিন্তু বিষয়মুখ-এর দেবাশিস বিশ্বাস ও বিকাশ গণ চৌধুরীকে আটকানো গেলো না । দেবী অভিজ্ঞান থেকে বিষয়মুখে এলেন । আগেকার বইতে অলঙ্করণে যে দেবী-উক্তি ছিলো, তা এবার পাল্টানো হয়েছে । আগেকার সংস্করণে বন্দনাবিলাপধ্বনি পর্বের পঞ্চম লেখাটি এবার ঐ পর্বের প্রথম লেখা হিসেবে এসেছে । বইটির প্রথম সংস্করণে কোনো উৎসর্গপত্র ছিলো না; এবার উৎসর্গ করা হলো শ্রীযুক্ত বৈশম্পায়ন ঘোষালকে, অনুবাদ পত্রিকার প্রস্তাবক ও কর্ণধার হিসেবে যাঁর পরিচয় বহুজ্ঞাত ।

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন প্রয়াত নিতাই ঘোষ ।



বন্দনা বিলাপ ধ্বনি

দেবী, মুদ্রা ব্যবহারে আজ সকল সম্পর্কগুলি হয়ছে কুটিল
অস্পষ্ট, একদেশদর্শী, বদ্ধ । যাকে পিতা বলে জানি
তিনি অবান্ধব, অবান্তর, যাকে জেনেছি প্রেমিকা, সেও নয়
হৃদয়জননী, যে বন্ধু, তার ব্যবহারে থেকে যায় অনভিভাবক
উদাসীন দৃষ্টিপাত । মানুষের মুদ্রা ব্যবহারে, যশ ব্যবহারে
এ সকল বিপত্তি হয়েছে । আজ কোন কবিতার স্তব শুদ্ধভাবে
শুক্লতার সঙ্গে তুলে আনবো, পুনর্বার হিরন্ময় হবে তোমার রূপের অমলতা ।

যেমন সম্পর্কে আমরা অনভিজ্ঞ, তেমন রয়েছি আয়ুভাগে । শিশু ভুলে যায়
তার মুগ্ধতাই আমাদের গ্লানি থেকে উদ্ধার করে পুনর্মুগ্ধ করে,
কিশোর ভুলেছে তার ব্রীড়ানত উৎসাহের রেখা আজো কালজয়ী,
যৌবন ভুলেছে তার মধুর ভঙ্গিমা আজো প্রকৃতির কোন ঐশ্বর্যই
আয়ত্ত করেনি,
প্রৌঢ়তা ভুলেছে, তার প্রসন্নতা
শীতের রৌদ্রের থেকে আরো বেশি প্রার্থিত এই পৃথিবীতে ।
আমরা কেবল
ক্ষমতা ও বোধের অভাবে শিশু,
সীমাজ্ঞানহীনতার জন্যেই আমরা কিশোর
ভ্রান্তমত্ততা ছাড়া আমাদের যৌবনের অন্য কোন অভিজ্ঞান নেই
কুটিলতাপ্রিয় বলে আমরা প্রত্যেকে প্রৌঢ় স্বেচ্ছানির্বাসনে
কণ্ডূয়নসুখে।

মানুষের ব্যবহারে আজো রঙ্গ আছে, চৈতন্যে রহস্য আছে - পাশাপাশি
এইসব থেকে গেছে, বড়ো দীর্ঘযাত্রার পর ক্বচিৎ রূপোলি রেখা
দৈন্য আারো ঘনীভূত করে ।
কোন্‌বেদীমূলে
তোমার উৎসবের জন্য সংগ্রহ করবো উপচার, সমিধ্ জ্বালাবো

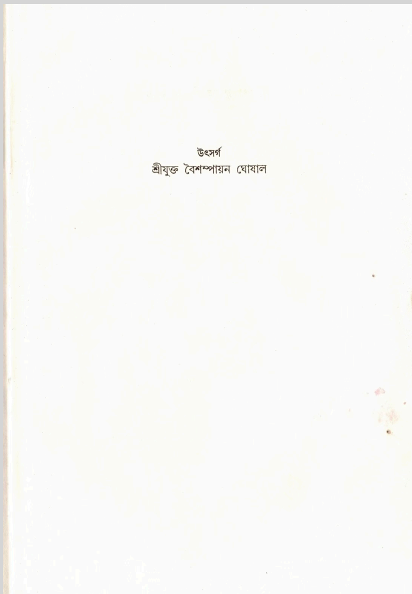
কয়েকটি বিরলকণ্ঠের নান্দীপাঠ ডুবে যায় অসুরনিনাদে
এরা প্রত্যেকেই সেই মুদ্রারাক্ষসের আর মহিষাসূরের সহচর, এরা দুর্যোধন ।

তোমার ও রক্তবর্ণ আনন ফেরাও, হে দারুণ, তুমি খড়্গ তোলো
অস্ত্র উপচারে তুমি পূজা করো এই রোগগ্রস্ত মানুষের ।

ত্বমিশ্বরী, প্রসীদ ।

রণপ্রণয় দাও আর্ত পৃথ্বীকে, বিশ্ব হোক নবপ্রণীত ।
উগ্রা প্রহরণে সৌম্যমুর্তিতে রৌদ্রনিনাদে
নিধনপ্রসাদে
সকল মূঢ়তার সব রিপুর্ভয় বজ্রাঘাতে মৃত, জীর্ণ হোক
রণসুগন্ধের দীপ্র সফলতা স্পর্শ করে যাক তিন দ্যুলোক
প্রসীদ
ক্ষুব্ধ চরাচর জীবন জর্জর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আনীত
ভুমির মুক্তির মতন ওই রূপে আবৃত করো তুমি শত্রুচোখ
চণ্ড আক্রোশে নিধন করো অরি, নির্বাপিত হোক পৃথিবীশোক ।

অতিসৌম্যা, অতিরৌদ্রা, প্রচণ্ড নায়িকা
সন্ধিক্ষণে, পরীক্ষায় প্রকাশ-আত্মিকা
দ্রোহশীলা, দারুণা, বহুশক্তি-সংগঠিতা
দ্রুতি-দীপ্তি-দ্যুতি তুমি অভিপ্রেত রণে সমর্পিতা ।


উৎসর্গ
শ্রীযুক্ত বৈশম্পায়ন ঘোষাল

অন্ত্যেষ্টির মতো তুমি এসেছো এবার, হে সুন্দরী ।
প্রজার আগুন থেকে বন্ধ্যা কবিদের কামনায়
তুমি আবির্ভূতা । নীলকমললোচনে
মত্ত পরিহাস জানে মানসের অনতিদূরেই তার মৃত্যু হবে

প্রয়োজনতুল্য ও শরীর দর্পে ভ্রমে রূপে
ক্যুটিলতাকুরুকুল নাশে সফলতা পাবে ।
শুধু অপমান নাও, রক্ষবাস, অবন্ধনে রাখো দীর্ঘবেণী
দেবী, জানো
বনবাসে আর অজ্ঞাতবাসে তুমি পরবাসচিহ্ন মুছে যাবে ।

দুলে ওঠে তোমার ও কৃষ্ণাগ্নির মতো মুক্ত কেশ
ছিন্নমাল্য
চরম সুগন্ধে যেন অকস্মাৎ ভীষণ হরিণ
চিরশত্রুবধ্যোদ্যত ।

সান্ত্বনার জন্য আর কে যাবে তোমার কাছে
কালো কেশে আগুন, আগুন
তুমি কৃষ্ণাজিনের সন্ধানে
লক্ষ্য করছ কৃষ্ণমৃগ, তাদের আহার্যে তুমি রাখো কৃষ্ণমদ

জ্যোৎস্নায় ছড়িয়ে দাও সহচরদের জন্য শ্বেতসুরা
নিজে রাখো রক্তিম কারণ ।

শিশিরের প্রক্ষালন শেষে
হাসো তুমি অনবদ্য মুখে
ওই দশনের পংক্তি সূচনা করেছে যেন
চুম্বনব্যাকুল ঠোঁট, জীবনতৃষ্ণার জিহ্বা, কাব্যপংক্তি, বাণী ।

হাসো, হেসে শুভ্র করো সঞ্চয়ের সকল কালিমা
উত্তাপপ্রদানে ব্যর্থ মনস্তাপ মুছে দাও উষা
আকাশে দিয়েছি নীল, ওই নীল ফিরে পেতে চাই
তুমি যাত্রা, রূপান্তর, দূত

খোলো খোলো নির্ঝরের চঞ্চলতা, উচ্ছল হিরণ
নির্মল তোমার হাস্যে ব্যয়শীল প্রাণ যেন বৃক্ষের আকাঙ্খা নিয়ে জাগে ।

হাসো দেবী, শ্বেত উত্তরীয়
গগনে ছড়িয়ে দাও, করো মুগ্ধ শত্রুও মিত্রকে ।

পৃথিবী পথে অজ্ঞাতের মধ্যে আজো তারা
মহাকাব্য অসমাপ্ত রেখে -
এখনো রণধারা
বধপর্বে জয়পর্বে ছন্দে নয় উল্লসিত প্রখর ।

অথচ তারই ছন্দে
শূন্যতার গর্ভে কাঁপে মন্ত্রে
ফাল্গুনের, মধুঋতুর বাতাস করে পর্যটন
অপ্রস্তুত তবুও তারা রহস্যের মতো রয়েছে নিথর ।

অরণ্যে তাই নীল দিগন্ত সন্দেহে প্রেমে একাকার নেমে আসে
অশ্রুবিহীন স্বচ্ছ মুক্তা স্পর্শ করেছে তুচ্ছতাময় ঘাসে
সমূদ্রে তার উন্মাদ ধ্বনি সন্ধান করে চক্রবাল
এদিকে পৃথিবী মশাল নেভায়, জ্বেলে নেয় ফের নেভা মশাল ।

স্পর্শ করো রূপ, রস, বহন করো তারই স্বাদ॥
গ্লানির বহু নীচে জ্বলেছে বৃশ্চিক অপাপবিদ্ধ ;
পৃথিবীপথে তার হাহাকারের আর মৌনসাধনার
স্পর্ধা দ্যুতিমান, মুখর প্রেমগান
ছড়ায় স্বরলিপি বজ্রমণিময় তানে ও ঝংকারে, অপ্রমাদ
নয়নে তার জয়, ভঙ্গী উৎসুক, নয় অসুখশাপদিগ্ধ
তাদের অনুভব, তাদের যৌবন এমনি অনিবার
অলংকারহীন বহু নদীতে স্নান

মূর্তিরচনা নয়, কেবল রয়েছে জয় প্রতীক্ষায়
স্পৃহার স্পর্শসুখে গৌরবে
দক্ষিণ আননের করুণাপ্রার্থনায়, নীরবতায়
যেন মণিপদ্মের সৌরভে ।
বার্তাবহেরা এসো, শ্লেষে আর কৌতুকে

ছড়াও করুণা ওই লীন লীয়মান মুখে
অমৃতের সন্ধানে ধ্বংসপ্রেমের গানে
পতনে ও উত্থানে
নাশ করো কুটিলতা, বিচুর্ণ করো এই রৌরবে
কেবল রয়েছে জয়, এবং জীবন লাভ, প্রতীক্ষায়
স্পৃহার স্পর্শসুখ গৌরবে ।

জেনেছিলো তারা সংহার
আনন্দিত শুভ্র উষ্ণীষ
নীল নভে নীল বন্দনা
সমুদ্রের কণ্ঠে কলস্বর
চেয়েছিলো তাই রিক্ততা
অঙ্গরাগ, সজ্জা যেন হয়
ক্রমশ স্পষ্ট হয় স্বর
স্বর্ণরথ নীরদমাঝে আসে ।

গ্লানির বহু নীচে জ্বলেছে বৃশ্চিক অপাপবিদ্ধ, জীবনঋদ্ধ
স্পর্ধা দ্যুতিমান
তবুও শোনা যায়, ক্রমশ দেখা যায়
দ্বিধা ও সংশয়ে ধূসর চারদিক, মুখর প্রেমগান

অলঙ্কারহীনা পরিব্রাজিকার বহু নদীতে স্নান ।

ততোখানি নয় রণস্পৃহা অঙ্গাঙ্গী জড়িত ।
দেবী
লোচনে ধিক্কার কেন হানো কেন স্খলদঞ্চলার সর্বনাশ
উদ্যত অগ্নির গতি নিয়ে দেশান্তরে ছুটে যাও
দেখো
সংকীর্ণ প্রাঙ্গণ থেকে সুকুমার গন্ধ, মালা তোমাকে দিয়েছি ।

জানি, নয়
বিশাল আশ্রয়
নয় সুখ, দুঃখ, এই বিলাসবিলাপ, এই পৃহস্থ প্রমাদ
তবু কি দেখোনি কোন তুচ্ছপুষ্প, তার মুহূর্ত-প্রসাদ?

আমি নই দিন, সুর্যকশায় উজ্জ্বল, আমি দক্ষিণের দেশে বিড়ম্বিত
ভ্রাম্যমাণ মাগধী মুগ্ধতা-
জন্মের ঋণের থেকে অনুভব করে গেছি মৃত্যুর গৌরব
আমার বিলাসে মৃত্যু, উপহারে ক্ষয়, তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না তার
সামান্য সৌরভ ।

ইতিহাস দেখিয়েছে দিগ্‌ভ্রান্ত স্বপ্ন যার ভবিষ্যৎ
সেও তো ঢেউয়ের মতো ভীত ক্রোধে প্রেমে
মুহূর্তে আশ্লেষ করে, ক্রমশই জটিল সময়
হত্যা চায়, কর্কশ আক্রোশ
অপূর্ণতা জেনে সব রচনাসংগ্রহ পুড়িয়েছে ।

সংগীতের মৃতদেহ পাওয়া যায় মানুষের কণ্ঠস্বরে আর
ভাষার শ্মশানে, মৃতদেহদাহ কোন জীবন দিলো না।
বিবর্ণ কবিতা আজো ছড়িয়ে রয়েছে লব্ধ প্রগাঢ় সন্ধ্যায়

চপলবর্ণিমাভঙ্গে, অকস্মাৎ মুহূর্তের স্তব্ধতায়
মূর্তিরচনা তার দিগন্তব্যাহত হলো তামসপ্রহারে
যেন ততো ব্যাপকতা আমাদের শিল্পকৃতি
কখনোই অর্জন করেনি । মৃদুস্পর্শ যাদের উপাস্য সেই সব কবি
প্রেতজননীর মতো ত্রস্ত আশংকায় গান্ধারীর মতো চোখ বাঁধে ।

এই মঞ্চে মদপানরতা দেবী নর্তকীর বেশে
রণনৃত্যে যুদ্ধমাদকতাময় স্বর্ণছলনায়
দারুণ সংঘাতকালে আচ্ছন্ন করবে শূন্যস্পর্শী রাক্ষসের মেধা
আর ধূর্জটির শূন্যভেদী বাণে দগ্ধসংগ্রহের মতো ত্রিচূড় সভ্যতা

চিতার ভিতরে স্বপ্নরাবণের মতো মিশে যাবে যার
পাবকে নির্বাণ নেই

শুভ্রতায় মিশে যাবে স্বর্ণের ছলনা আর উজ্জ্বল তামস ।

আবির্ভুতা হলে তুমি নিনাদ করবে তারা
উচ্চযুদ্ধশঙ্খে ।
আকাশে কাঁপবে মেঘ পৃথিবীতে বায়ুবেগ
ঘোররণাশঙ্কে ।
মূঢ় মানুষের হাতে প্রেমিকের অর্চনাতে
নেই যুদ্ধশক্তি
তুমি এলে রণারম্ভ, চৈতন্যপ্রহারে জানি
তোমার আসক্তি ।

ছাত্রদল উঠে আসে, জেনেছে ইতিহাস আহূত আত্মার সমতুল
মিতভাষ অর্ধবাক, স্পষ্ট ততো নয়, যা হলে জীবনের নির্ভার
কেবল জীবিত থাকা, বাঁচতে দেখা শুধু, বিনীত দর্শন শিক্ষার
শরীর আনতে পারে, মাত্র এইটুকু রয়েছে সান্ত্বনা নির্ভুল ।

মানুষের হাতে অস্ত্র শোভা হতে পারে
তার বেশি নয় ।
মানুষের চোখে শোক রূপ শুধু হতে পারে
তার বেশি নয় ।
মানবশরীর শুধু রণ থেকে শোক থেকে সরে এসে
অর্থাৎ মাহাত্ম্য থেকে দূরে এসে শুধু সামান্যের মতো ভালোবেসে
বন্ধীত্বের মুক্তি দিতে পারে, উজ্জ্বলতা, শোভা থেকে নেমে
সাধারণ প্রেমে ।

উপমাবিহীন কালে যুদ্ধ শুরু করো, সকুল মুগ্ধতা দূরে যাক,
ভ্রমণ স্তব্ধ হোক, মলিন হোক মধু, কণ্ঠে ভাষা হোক শব্দের
অস্ফুট দোলাচল, প্রদোষশীর্ণতা ঘনাক পৃথিবীতে গাঢ়তম
পুনঃপ্রহারে তার শত্রুঘাত তবে পুনঃসার্থক হতে পারে ।

যা কিছু সর্বস্ব হতে পারে, দেবী, তার বাইরেও অতিরিক্ত কিছু
বেড়ে ওঠে, কিছু ফুটে ওঠে
উৎসর্গ থাকবে তাই, কিংবা উপহার । এই গ্রহে
প্রথমে প্রকৃতির সামনে, পরে আমাদেরই প্রকৃতি সম্মুখে
আমরা রয়েছি ঠিক পূর্বপুরুষেরই মতো অসহায়
পতাকা রয়েছে আমাদের সেরকমই প্রতিষ্ঠা উন্মুখ ।

হে লীয়মান নিদ্রিত সৌন্দর্য, জাগো ভ্রুকুটি নিয়ে
সংহারে ছলনা নিয়ে ।
হে মাহাত্ম্য, অজস্র আত্মতা আজ হননে নিরাশ হয়ে
তোমার প্রতীক্ষায় আকুল ।
হে ঐশ্বর্য, নিজেকে উৎসর্গ করো ঐশ্বর্যবিহীন আর দারিদ্র্যবিহীন
সাম্য-রূপ-শিল্প অভিষেকে ।

কেন দেখো, কেন দেখো এই অসহ্যসহন ।
দ্রষ্টার ভুমিকা নয় অই মুখমণ্ডলের
যে মুখ দিব্যাস্ত্র, যে শরীর স্বর্ণ-প্রহরণ ।

এমন যে আমি জানি সুচতুরভাবে এই সীমিত আয়ুকে
পার করা যায় । কিছু বিলাসিতা, কিছু সম্পর্কের ছদ্মরণ
কিছু সাংবাদিকতায়
আমি পার করে নেবো সীমিত জীবন ।
শরীরের আয়ু যদি এতোই নির্দিষ্ট করো তবে কেন ভিন্ন কোন
তাৎপর্য রাখোনি?
কেন তুমি ক্রিয়াহীন দর্পনের মতো চোখে এই, তমোল্লাস দেখে
স্মরণ করোনি
অসহ্যসহন, হীন প্রতিশোধ
আমার শরীর থেকে ভয় ও হিংসার এই রাক্ষস-আগ্নেয়অস্ত্র, ধ্বংসজনি
ছুটে যায়, আঘাতে ও প্রতিঘাতে ফিরে আসে, লয়হীনতার দুঃখে
পুনর্বার শক্তিশালী হয়, রহস্যের বারুণাস্ত্রে তুমিও করোনি
তার প্রতিরোধ ।

অসুস্থ বৈরাগ্য থেকে স্ফীত সুখ
রাক্ষসকালের আলো ফেলে ঢেকে রাখে দিক্‌ভূমণ্ডল
পৃথিবীতে দুপ্রান্তের প্রাপ্তি এই । উন্নতির অন্তিমে পতন
যতো স্পষ্ট করেছিলে, পতনের অন্তে কি রয়েছে
অনুরূপ স্বচ্ছ তুমি তাকে তো করোনি ।

প্রিয়তমা, এইখানে তোমার আমার রণ
যদি নির্বিকার থাকো আমি হব বন্দনাবিমুখ ।
আমিও যে জানি ওই দিব্য নির্বেদের মুখ
পূনর্বার অভিমানে উৎকণ্ঠায় মানুষেরই মতো হয়ে যায়,
যতো অত্যাচার দেখেছিলে, ততো শ্বাসরোধ

এখনো দেখোনি?

তুমি স্বর দাও, তুমি করো মন্ত্রের গঠন
শুধু পূজা নয়, শুধু প্রেম নয়, শুধু মৃত্যু নয়
পূজা প্রেম মৃত্যুর তাৎপর্যে ভাস্বর করো এ বিন্যাস
আমি দেবো এই কথা, আনন্দ-ধ্বনন ।

স্পর্শ-অভিলাষ ততো জাগরিত নয়
যতো বেশি সমুৎসুক রয়েছে দর্শন ।

সঙ্কীর্ণতা আছে । কেন ছদ্ম উপহাস
করো, দেবী, জীবনে বিপুল আছে ত্রাস
মগ্ন নয় নতজন, জানে অনিশ্চয়
সর্বব্যাপী । তাই তার চোখে মায়াঞ্জন
মৃত্যুর ছলনা হয়ে ঘনিয়েছে । তুমি
নির্মাণ করোনি তার স্বচ্ছ ধ্যানভূমি ।

তোমার বোধন হোক, হোক নান্দীপাঠ
ত্রস্ত নর দেখে যেন দিগন্ত নির্ভীক
এই লগ্নে রক্তময় রৌদ্রে স্নান করে
অক্লেশে চিত্রিত করে তোমার ললাট ।

তারপরে, বিসর্জন নাও তুলে করে ।
তোমার বোধন আজ হোক স্বাভাবিক॥

অনুভব কালক্রমে বিস্তার, ঘনত্ব পেলে হয়ে ওঠে উপহার
উৎসর্গ বা উপচার
থাকেনা নিজের ।

কখনো আমার নয় বলে তুমি অকস্মাৎ প্রত্যুষের
অকস্মাৎ মধ্যাহ্নের হয়ে এসেছে নিবিড়
অথবা নৈশত্যাতুলা স্পর্শ করেছ গভীর ।

পারোনা নতুন কিছু উপহার দিতে
এখন সময় তোমারি নির্মাণে ধ্বংসে তোমার দুহাত থেকে
আমাদের প্রাপ্য নিয়ে নিতে ।
আকৃতিবিহীন স্পষ্টতায়
যদি কেউ ভেঙ্গে কিংবা গড়ে নিতে চায়
প্রাচীন সম্পদগুলি, প্রাচীন শরীর - তার তরঙ্গধারণ প্রয়োজন

হে পদ্মসম্ভবা, তুমি নৃত্যশীলা তরঙ্গের মধ্যে স্থিত সেই দেবী - মনে করো
          দৃকপাত করো ওই মথিত পদ্মের দিকে
তুমি মন্ত্র বলো । তারপর
সূর্যস্নান নয়
সূর্য আমাদের ভিতরেই স্নাত হবে ।

তবে কোনো গান তুমি শেখো নাই, যা এখন
নবমাল্য দিতে পারে, দিতে পারে শ্রবণের মাঝে
তুর্যধ্বনি ।

সাংকেতিক শনিপথে আনন্দিত শোকে তুমি হেঁটে যাও, দেবী
ছায়া বাড়ে
ছায়া দীর্ঘ হয়, ছায়া বহু হয়

প্রজ্ঞাস্ত্রের সম্ভাব্যতা নিয়ে ওই কেশে কাঁপে অন্ধকার তূণ ।

ছায়া অনুচর হয় ছায়াগুলি সহচর হয়
কর্তব্যের মতো কাঁপে তাদের শরীর

ক্ষমাহীনতার স্রোতে তারা ডুবে গিয়ে তুলে আনে পাত্র করুণার ।

সঙ্গীতের মতো ওই দেহ তবে মুর্তিমতী হবে ।

দেবী

জন্মের অস্পষ্টতা আর্তির কারণ হয়ে

আমাদের পিপাসার কাছাকাছি আছে ।

আমাদের মৃত্যু বড়ো আকস্মিক

আমরা যাপন করি অতর্কিত যৌথ জীবন ।

নির্বাচিত কিছু প্রাণ নির্বাসনে যায়

অজ্ঞাত অরণ্য অশ্রুরাশি দিগন্তে ছড়ায়

মুক্তা হয় - তবু আচম্বিত এই মুক্তা জেনে

সীমাজ্ঞানহীন আমরাই নিয়েছি শাসন ধ্রুব মেনে ।

তীর্থস্থানে হাওয়ার বিলাপ

পর্যটনে পথের বদলে ক্লান্তি

সুখে দুঃখে অভিভূত বহু শিল্প হয়েছে প্রলাপ ।

দেবী

পরিচিত হতে তুমি পারোনি, রয়েছ তাই বিদেশী প্রবাসে

এ জীবন আজো পরবাসে

কেবল তৎপর

দেবী

প্রস্তুতির কাল কেন এতো দীর্ঘ, যতো হত্যা, ততোই কি হবে

পুনরুজ্জীবন ?

কোন আত্মহননের পর, কোন শোক অবকাশে?

কে জন্মকে স্পষ্ট করে, কে মৃত্যুকে করে আকাঙ্ক্ষিত

আমি তা জানিনা । জানি তুমি আজো অতর্কিত ।

দেবী, আজো তুমি সহে যাও মূঢ়তার নষ্টফুলগুলি
মন্ত্র উচ্চারণে ভ্রম, অঞ্জলি প্রদানে অশুদ্ধতা, নিকর্ষ পূজার
আজো তুমি নিজের সংযোগে ততো নিষ্ঠাবতী নও
মৃত্যু যেরকম । তাই মানুষের কন্যকাবিহীন গৃহে
সঠিক আকাঙ্ক্ষা নেই, চরিতার্থতার মতো পুণ্য নেই -
অসাফল্য শীর্ণ করে দেয় সকল সম্পর্ক, প্রেম,
মুহূর্তের লব্ধ উজ্জ্বলতা । মানুষ পিছনে গিয়ে দেখেনা অতীত
মানুষ সামনে এসে প্রতীক্ষিত ভবিষ্যের আতিথ্য করে না,
এই যে মানুষগুলি, যারা ইহলোক, তারা শুধু কোনক্রমে বর্তমান আছে ।

এখন সমস্ত গৃহে কন্যকার পরিবর্তে স্ত্রীলোক রয়েছে
নরকনিধনকর্তা পুত্রদল তাই
নারকীয় ত্রস্ত ধর্ষণের মধ্যে কেবল জানান দেয় শরীরের ব্যবহার
মূঢ় হতে পারে আজো । প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, মুদ্রা - অভিলাষ ছাড়া
অন্য কোন প্রার্থনার অবয়ব নেই আর, বীরগণ হয়েছে ঘাতক ।

দেবী, এ তোমার অক্ষমতা । আমি ত্রস্ত চেয়ে দেখি
পৃথিবীর শ্যামলতা সাধারণ হয়ে গেলো, সূর্য ম্লান প্রাত্যহিক
পৃথিবীর বিচিত্রতা আজ শুধু ষড়যন্ত্রী রাজাদের প্রমোদ-কারণ,
সততা গিয়েছে বনবাসে, অন্ধ যৌথতার মতে
মানুষের শিল্পগুলি অবসন্ন উন্মাদনা ছাড়া
অন্য কিছু প্রমাণ করে না ।

কিছু দূরে ব্যাধের জীবন নিরাপদে, আত্মমৈথুনের আলোড়নে
স্বল্পকটে স্বল্পসুখে
কোলাহল করে যায় । জেনে গেছে দক্ষিণদিগন্তে নেই উদ্যত কৃপাণ ।
বহনের পর আমি শ্রান্ত বোধ করি, বহুবার হতাহত হয়ে

আমিও দেখেছি

তোমার শরীরে আজো বহুসংযোগের সৌন্দর্য আসেনি
তোমার সঞ্চয়ে ততো উজ্জ্বল আনন্দ নেই যা তোমাকে
নিশ্চিত ক্ষুরপ্র দিতে পারে
তোমার স্মৃতিতে ততো দুঃখ নেই ।
এখনো কিশোরী আছো তুমি
এখনো স্বপ্নের মধ্যে অবাঙ্মনসমৃশ্য, মন্ত্রধ্বনি
নিদ্রা আনে, নিরর্থক চিত্রে তুমি বিদীর্ণ শতধা ।

আমার যৌবন যায়
আমার যৌবন যায়
ক্লান্তির অরণ্য ঘুরে, মেঘহীন সূর্যহীন আকাশের নীচে
উজ্জ্বলতাহীন তাপে, তোয়হীন শীতলতা
এর মধ্যে এ বসন্তকালে আমি কাঁধে এনেছি সমিধ্, কাঠ,
অভিজ্ঞতা, অন্য কিছু নয়
চেয়ে দেখো, আমার যৌবন অসতর্ক, যায়
নিদ্রা চায়, মৃত্যুকে এমনভাবে বৈফল্য দেবো না আমি
তুমি স্বপ্নছেদ করো, তুমি এই মূঢ় পুরুষের-জীবনের
শ্রান্ত মাথা ক্রোড়ে নাও, ফিরে ঘাক ভয়ংকর যম॥

রক্তে ভ্রমর নীলগরলের ছায়াগুঞ্জনে ছড়ায় বিলাস
যৌবন তবু ভুলে যায় তার কৈশোর-অপমান
বিস্ময়ে তার ফাল্গুনমাস
সহসা গন্ধে ভরেছে বাতাস

এখনো শুনিনি তার প্রিয় গান
জানালা আমার খোলা আছে যার কাছে তার অবনত
ভঙ্গী রয়েছে সুচিরকালের, যেন তার অবদান
বারবার ঘটে জীবনে যেমন প্রার্থিত কোনো মৃত্যুও অবগত
অগোচর কোন বিনাশকথার, যেমন জন্ম রয়ে গেছে তদ্‌গত
রক্তে ভ্রমর নীলগরলের শ্বেত-অমৃতের আজো করে সন্ধান ।

দেবী
সেই মধুপাত্র থেকে তুমি পান করেছ আসব ।
অসুর তোমার কেশ
আকর্ষণ করে যাচ্ছে
তুমি স্নিগ্ধবিহ্বলমত্ততা
তুমি
অক্লেশে শিল্পের থেকে
লবণ-আক্রোশ, ফেনোৎক্ষেপ, বিঘুর্ণিত তরঙ্গনিচয়
তুমি
সমুদ্রকে শান্ত হতে বলো
শুধু এক ক্ষিপ্ত সিংহ উল্কার মতো স্নেহহীন অন্ধকারে
তুমি
ছুটে বেড়াচ্ছে যথাবধের আয়োজনের জন্যে
সর্বপাপঘ্ন ওই মহাদ্যুতি তরুণার্করশ্মিচোখে আধো নিনীলন
এখনো রয়েছে

চিরসখাতুল্য তার পূর্ণ উন্মোচন
এখনো হয়নি, এখনো পড়েনি তাতে ঈষৎ মৃত্যুর নীলনম্র ছায়া
মাধুরী-উদ্ভাস
অকাল উৎসবে শুধু এক ফাল্গুনের মাস
প্রাচীন লাবণ্যগন্ধে স্তোকোৎফুল্ল করে এই আবিল বাতাস ।

দেবী

যে আত্মা রণ থেকে ফিরে এলো পরাজিত, দেখো
শরীরশিবিরে তার
শুশ্রূষা করেছি আমরা, স্তোত্রপাঠে, নৃত্যে, অর্চনায় ।
আজো সহমরণের অঙ্গীকারে
সহজীবনের কথা অঙ্গীভূত করে ।
চিতারোহণের পর ভালোবাসা
তুমি তার পদ্মগুলি তুলে নাও
তুমি তার সৌরভে মন্থর করো ওই ব্যাপ্ত অলকের জাল
অসুর যা আকর্ষণ করে মরে, অসুর হয়েছে যাতে আকর্ষিত ।

কেবল এখনি
শব্দ নয়, চিত্র নয়, স্বর-সুর, মূর্তির স্তব্ধতা - কোনকিছু নয়
যে মুহূর্তে চূড়ান্ত আঘাত
সে মুহূর্তে নৈঃশব্দ্য, শুক্ল বিবর্ণতা, জলরেখা শান্ত পুনর্বার
পুষ্পের দীপ্তিতে শুধু জ্বলে ওঠে মহানভে অই অসিধার
স্মৃতি নয়, ভবিষ্যৎ নয়, নয় পথ, নির্মোক সঞ্চয় ।

প্রথমে সংহত পদক্ষেপ, পরে চঞ্চলতা
শুভ্রমেঘখণ্ডে যেন আত্মজের স্পর্শে ভাসে
মুহূর্তের নীরবতা, শতাব্দীর মুখরতা
আকাঙ্ক্ষার মতো এই ধীর নিবিড় আকাশে ।

প্রণম্যা, তোমার কুন্তলে
স্বর্ণময় আরক্ত অঞ্চলে
গ্লানিবহনের পাপচ্ছেদ
দ্যুতিকীর্ণ পষ্ট ভেদাভেদ ।

তবে জয়দণ্ড তোলো, সুনির্মিত করো স্বর্ণজয়রথ
দেবী, নির্ধারিত করো ভবিষ্যৎ,

অস্পষ্ট দর্পণবৎ

এই জীবনের মধ্যে বেছে নেবো কাকে, গৃহ কিংবা পথ ।

রম্য করো স্থান, গম্য করো দুর্গমকে

দীপ্ত করো তেজ, আর্দ্র করো নির্মমকে ।

বেদনার্ত চোখে এই সন্ধ্যা বহুদিন বাদে নীলপদ্ম তুলে নিলো

এমনই চকিত তার

উৎসর্গের উপহার

মেঘরাগিণীর মধ্যে কূটজগন্ধের হিমরাগে যেন অরণ্যের

স্নানস্পর্শে ভিজে যায়

রুক্ষতার পুষ্পরাশি

নিষিক্ত হয়েছে তার মেধা, সঙ্গ, এখন পথিক আসে গৃহে যেন

কিছুদিন অবকাশে দেখে যাবে

শরত-শেফালী থেকে কতোখানি দূরে আছে, চূর্ণ বসন্তপলাশ ।

আরো নীলপদ্ম বাকি আছে । অকালবোধন

এখনো হয়নি শুরু । সযত্নরচিত পুষ্প ধীরে যায়

বিষণ্ণবিকাশ থেকে ওই প্রসন্নপ্রকাশে ।

সামনে, প্রান্তরে সূর্য অস্ত, বেগে ঝড় আসে

বজ্রে চূর্ণ করে দিতে চায় - এই ভীষণতা, আবিলতা

পৌনঃপুনিক হলো ।

ঘন আস্তরণে দ্রব হলো চরিত্রকালিমা ।

দেবীমুখমধুরাগে নিষিক্তশেফালিগুলি যেন জোৎস্নায় উষায়

পাপক্ষালনসৌরভে

উন্মুখ রয়েছে স্পর্শে, মনে হয় শ্যামলের শিলীন্ধ্র ছড়িয়ে আছে
মধুলুব্ধভ্রমরের মতো আসে সূর্যের পরাগ ।

স্নান, পুজা, শেষ হবে, শুদ্ধি আর সংযুক্তিতে
অমৃতপানের পর ত্রিসন্ধ্যা আসবে নিয়ে তার প্রসন্নপ্রৌঢ়িতা ।

বহুমুখ ব্যভিচার রয়ে গেচে, তাই
এমন উৎকীর্ণ ভঙ্গিমায় বারবার দেখা দেয়
পদ্মের মৃণাল, গন্ধ, রেণু, মধ্যভাগ ।

দারিদ্রস্বভাব এই, বদ্ধতাকে সে ভাবে দৃঢ়তা
অস্বীকার করে ব্যভিচার
উচ্ছলতা দেখে তবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে তার...
যে সব ভয়ের খাদ কখনো পিছনে ঘুরে দেখা ভালো নয়
তার শূন্যতার দিকে ঠিক অই দরিদ্রের কৌতূহলী চোখ যায়
ভয়ের গহ্বরে যে প্রাচীন অজগর রয়ে গেছে
পড়ে তার হিংস্রমোহ কঠিনচুম্বক চোখে, মৃত্যু আকর্ষণে
দরিদ্র স্বভাব এই, তার বাহুপাশ যেন ধৃতরাষ্ট্রে ধৃত
লৌহমূর্তি আলিঙ্গন
তার প্রেমে থেকেছে আক্রোশ
সামান্যের কাছে তার আরো সাধারণ হয়ে ক্ষমাভিক্ষা
বিশেষের কাছে
আকাশের কাছে
সে চায় উজ্জ্বল দণ্ড, কিংবা বজ্রপাত, রৌদ্ররোষ
পরবর্তী আর্তনাদে চূর্ণ হয় তার এই বিচিত্র সাহস
কলঙ্কে লাবণ্য নেই তার - প্রেমে আজো রয়েছে আক্রোশ ।

ভুলে যাই, আমারো রয়েছে এই দরিদ্রস্বভাব । আজো সূতপুত্র বলে

তুমি নিম্নস্বরে ঐশ্বর্যের - মহিমার স্বয়ংবর থেকে আমাকে ফিরিয়ে দাও
আমার চরিত্র থাকে নিষ্ফল শ্রমে, অপমানে-প্রতিঅপমানে

ভুলে যাই
ঈর্ষা আক্রোশের এই সর্পবাণ তোমার উজ্জ্বল কিরীট বিচ্যুত শুধু করে
তাতে তুমি বিজিত হবেনা
বারবার পৃথিবীর জটিল অন্তরে আমার উন্মাদ রথচক্রডুবে যায়
শোক-হিংসা-রক্তনীল আকাশে আমার
সূর্যমেধা দীপ্ত প্রক্ষালনে অস্ত যায়
সবিস্ময়ে দেখি এই নিহত শরীর তখনো প্রণাম নিয়ে আছে উর্ধ্বকরে

হে প্রেম, জয়ের বেশে লুণ্ঠিত বিজিত এই বাণবিদ্ধ শরীরের দিকে
কেন একবার আর্দ্র দৃষ্টিপাত করো
তুমি পরিচয় দাও, তুমি জানো সব যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র নয়
মধুঋতু মধুবায়ু মধুক্ষর পৃথিবীর ধ্বননে - উৎসবে
আরো একজন যাবে, যেতে চায়, তুমি পরিচয় দাও তুমি জানো
দরিদ্র-স্বভাব নয় আমার প্রকৃতি ।

ধূপের মতন রাত । তুমি কি এসেছিলে । তন্দ্রা সংশয়, উৎকর্ণ ।
স্বপ্নে জেগেছে উষা । যা যায়, সব ভুল । জীবন মনে হয় অধমর্ণ
নিজের ভুলের কাছে । অজ্ঞ ছিলো সেও । কেবল প্রিয়তর, শ্বেতবর্ণ
অশ্বটি ছুটে গেছে । রাখি নতমুখ । উন্মোচিত হলো তমোপর্ণ ।

ভ্রান্তির ডাক
যরা শুনতে পায়
শেষে মেলায়
মৃত্যুর ভিতর
জীবনহীন

বিস্মরণের

হাত স্পষ্ট হয়

ঘনায় ক্ষয়

বদ্ধতা, বিনাশ

দীর্ঘশ্বাস !

রাত্রির নতমুখ তুলে ধরো হে অরুণা, সবিতার আকুতিও দ্যুতিমান শৈশবে

নশ্বর অশ্বটি ছুটে গেছে মাঝরাতে, তীর্থভ্রমণহেতু

সেও কি সরল হবে -

তমোপর্ণের শোভা রঞ্জনমুক্তাটি কোনোদিন পাওয়া যাবে, কুমুমনিরঞ্জন

স্বপ্নে জেগেছে উষা, ভ্রান্তির নতমুখ তোলো দেবী, কাঞ্চন ।

প্রসন্ন দক্ষিণ শরতের উৎসব

আশ্বিন আননের কান্তি

অস্ত্রের দীপ্তিকে বসন্ত দেয় শোভা

করপুটে পদ্মের শান্তি ।

নীলোৎপল নাও, নাও এ কোকনদ হৃদয়ের

তোমার রূপ দাও, তোমার জয় দাও অভয়ের

দেখাও জীবনের শোভার বিস্তার দূরলীন

জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শত্রুবধ করো, জীবন প্রার্থনা আছে যার

তার

অগ্রগতি করো অরিহীন ।

এ রণমত্ততা তীব্র আক্রোশ

অস্ত্র উদ্যম স্ফুরিত মহারোষ

বাসনা বেগবান হৃদয় যুযুধান

প্রসাদে করো তাকে যুধিষ্ঠির

উন্মোচিত হোক মহাতিমির ।

অস্ত্রের দীপ্তিকে বসন্ত দেয় শোভা

আশ্বিন, আননের কান্তি -

দক্ষিণ উৎসবে প্রসন্ন শরতের

করপুটে পদ্মের শান্তি ।

দেবীধ্বনি

সোহহম্ ॥

আছি এই বিশ্বের   আবর্তে ঘূর্ণনে

প্রতিভা ও বাসনার   অমৃতের মন্থনে

প্রতি বধে, প্রতি প্রেমে   শ্রমে, রূপে, ভ্রমে, হেমে

আছি অনাবিষ্কৃত   সাধনা হৃদয়ে ধৃত

উপমাবিহীন, তবু নিরুপম ।

সোহহম্॥

ভাঙে তমস্বান্, মহাদ্যুতিবান কুসুমসঙ্কাশ

প্রকাশে প্রণামের ছন্দ ত্রিতালের, লীলার পরিহাস

এখন ভাস্বর, এসেছে মহাকাল নব, অনশ্বর, দয়ধ্বম্ ।

সোহহম্॥

জীবনবীজে পাপ অগ্রসর হলো, নিধন অগ্নির শিলাজতু

স্পর্শ করে তার শূন্যবোধজাত মূঢ় প্রসাদ, অয়মারম্ভম্

শুভায় ভবতু ।

এখন বাতাস ছড়ায় কেবল মুদু তুহিন

অবিশ্বাসের জয়ে, সন্তাপে রাত ও দিন

অসম প্রভায় কারে যায় সব শেষ আঘাত

কেউ অচেতন, কেউ সচেতন অকস্মাৎ ।

আমি মহারণ দিয়ে প্রহরণ নিয়ে আসছি, অন্ধ দ্বেষ
তাই আবরণ দেয় আমার উপর, এইভাবে তার শেষ
ক্রমে দ্রুততায় যায়, অসুর ধ্বনির এই হুংকর, ক্রোধ
যেন মায়াময় ভয় বিস্তার হয়, বন্ধু, হবেই রোধ
এই বিনাশের আর জীবনের ক্ষয়, যখন সময় হয় ।

ওই চন্দ্রকে নাও রণবধু আর তারাদের করো চঞ্চল
প্রতি অস্ত্রের লয় ঘটাও অস্ত্রে, কৃপাণকে করো উজ্জ্বল
আর বৃক্ষের রূপ আঘাত করুক বিষময় বাতাসে
ওই চন্দ্র ছড়াক মোহের মৃত্যু মৃত্যুর আভাসে
তবে বিনাশের আর জীবনের ক্ষয় তখন সময় হয়

হৃদয়সমুদ্রজাত চন্দ্র, হে ক্ষীরোদার্ণসম্ভব, শঙ্খধ্বনি করো
শত্রুঅমর্ভয়তুল্য জ্যোৎস্না আর তুষারবাতাস হয়ে ঝরো
প্রণয়রূপের চন্দ্র, সাধনামুকুট তুমি বৈরাগ্যভুষণে রাখো ধ্বনি
যে মুহূর্তে বিজ্ঞানে আঘাত, সংগ্রাম তখনি ।

এই রণদাহে আগুনের প্রবাহে
রাখো অঞ্জলি মহা জীবনের নবাহে
এই মারণধুম দিক্‌পতির ধূপ
দূরে নীলিমাকঠিন তার সুবর্ণ রূপ ।

তিনি অসংখ্য মানুষের প্রাণোদ্ভাস
তাঁর শিল্পরুচিধৃত যে সর্বনাশ
তাতে ভাঙে যবনিকা অসুরপতন
ধ্রুববন্দনাসঙ্গীতে নবোন্মোচন
আর পুনসৃজন সব হলাহলের
তিনি বহুজনের তিনি পুঞ্জবলের ।

আমি তাঁর অনুরূপ আমি সর্বজনের
স্বচ্ছতা, স্বর আমি উজ্জ্বল শর
মোহ অভিঘাতে ক্রূর বঞ্চনাতে
প্রিয় মায়াজালে ওই অরিকরালে
রাখি লাঞ্ছনা, ক্লেশ আর উৎপাটনের
ব্যাখ্যা কারি । আমি সর্বজনের

হে মহাগামী বেগ, বিকীর্ণমুর্দ্ধজ, চক্রাকার
করালকালধূলি হে ঘন প্লাবন বিশ্বাধার
পতনজাত ভয় রুদ্ধনিশ্চয় শংকাশীল
লোল লেলিহান কৃষ্ণখরশান রক্তাবিল
হানে লৌহফুল পরিঘরুদ্রতুল শিল্পদক্ষিণ মুখ
অট্টপ্রেমনাদ চুর্ণস্ফটিকস্ফোট শব্দধ্বনিজাত সুখ
রণসন্তাপে কালআক্রোশে বজ্রঘুর্ণনে জয়
শোকাশোক জয় বর্ণবেগ জয় দিব্যহস্তা জয় জয়

প্রিয়, জীবনলাভে তুমি নাও প্রহরণ
চিরপ্রেমে বন্ধুতা করে মরণ ।

তুয়া উল্লাসে সাগর উপজিল
লহরী মুক্তি চায় আজ
দূর বনতট মূর্তি বিরচিল
বাসনা যায় হৃদিমাঝ ।
প্রণয়জটিল মুগধ সংসার
চাহে বহু মহাবীর
এ প্রেমসময় হেরণমাধৰ

ধনুকে আরোপিত তীর ।
কতনা জীবন   প্রভাতমলিন
স্বরবিকারে হয় মৃত ।
রূপ তুহুঁ-অধিগত, না বুঝি সংশেয়
কেন ভবিষ্য-বিভীত ।

নিষ্ফল শ্রম
শুধু নিজ বহন
এই দহন
রক্তাক্ত ভ্রম
অগ্নিহীন :

শূন্যের এই
হয় পর্যটন
প্রজ্বলন
ঘোর ভীষণকেই
করে নবীন ।

গর্ভের কাল
হলো পূর্ণ শেষ,
ভীত অরুণ
তোলে রুদ্রতাল
প্রতিনিমেষ
উৎকণ্ঠায় উদ্বেগ জটিল
যেন দ্বিগুণ
কোন আকুলতায়
এই নিখিল ।

মেঘ বাজে অন্তর মাঝে

এলায়ে পড়ে তার ছড়ায়ে পড়ে তার মহাজটা
প্রতিরোধে ভীষণ বিরোধে
অশিবসেনা যেন নৃত্যে ঝংকৃত আলোছটা

বিচূর্ণ দ্বার ভাঙে তীব্র রোষ রণপ্রদোষ এই ছলনা তার সফল হয়
বিশ্বের রূপ যায় সৌন্দর্যে ক্রূর গর্জে দুই ধ্বনির নাদে প্রাণ প্রলয়

নমো হত্যা নমো কৃত্যা ধ্বংসদলনমন্ত্র ।
তুমি বজ্রবহ্নিঅর্পিত তুমি প্লাবনোৎক্ষেপতর্জিত
তুমি কৃতকৃতান্তস্ফুরণ তুমি পাপের বিচ্ছুরণ
সাধনাপথপ্রণয়প্রাপ্তিবিঘ্নস্বরূপ সময়বোদ্ধা যন্ত্র ॥
নমো ভেদ নমো বিভেদ কূটিলকূটতন্ত্র

মূঢ় স্বপ্নের মুণ্ডমালা বিধৃত ওই কণ্ঠে দোলে দোলে
পলায়নপর শান্তির শব নিদ্রাভেদী জটিল বিকট রোলে
রক্তআকাশ রক্তবাতাস বসাঘ্রাণ, হাড়হিমের স্পর্শ
ভীমজলনীলে ঘূর্ণিত যতো তারকাদলের অলঘু হর্ষ
আর্ত তৃষ্ণা ক্রমশ রক্ত আগুন ও উৎসর্গে
বহুবধ চায় অলস জীবের স্বয়ংরচিত স্বর্গে ।

মুণ্ডস্রজা কালধ্বজা ধূমাগ্রজা রুধিরে
তৃপ্তদীপ্ত সমরক্ষিপ্ত সেনাপ্রজা অচিরে
বহুমুখ অগ্নিভূক দেশান্তর ধাবিত
দৈন্যদীর্ণ স্বর্ণকীর্ণ সত্তারূপে প্লাবিত
মেঘসঙ্গী বহ্নিসঙ্গী কালরঙ্গী মত্ততা
কাললগ্নে হত্যামগ্ন নবনগ্ন সত্যতা

ক্রুদ্ধ উৎক্ষেপ সংহার লাস্য
ঢঞ্চল স্বর যেন বিমর্ষ বিদ্ধ

প্রণয় মায়াজাল-শূন্য হাস্য,
রুদ্ধ ব্যাকুলতা বিশ্বাসস্নিগ্ধ ।
অরূপ ক্রান্তির বোধির অতিথি
রুদ্রাত্মজ তাই প্রকাশপ্রকৃতি
ছড়ায় নীলনভে রৌদ্রের প্রতীতি
এ দীন হৃদয়ের সঙ্গে শরণলাভ
যুদ্ধ চেতনার অর্জিত উত্তাপ
অস্বচ্ছ ঋকের ধর্মে জীবনলাভ ।
উদার অরুণ বসন তাদের
    পরিহাসশীল ভঙ্গী, আনন
নিঃস্ব জটিল কৃপণ করুণ
    মুছে যায় তার মুগ্ধ ধ্বনন
উদাত্ত হয় নির্বেদে, রূপে
    বিস্তার পায়, দেয় বিকীরণ,
পরিহাসশীল ভঙ্গী তাদের   উদার অরুণ মুগ্ধধ্বনন ।
যমদণ্ডে   কালচণ্ড   নিনাদিত নিধনে ।
অচিকিৎস্য   ক্ষয়স্পৃশ্য   মনুপুত্র - অরি রণে
হানে কিরীচ,   তাই মারীচ   ছলনাময় বার্তাতে
শব্দ নাশে   অবিশ্বাসে পূরীষ হানে   প্রভা-তে
বিকটরূপে   মধুররূপে   অস্থায়ী   সৃজনে
আহত করে   ভবিষ্যৎ   বর্তমানের   বিজনে
এ মায়াজ্ঞানী   মিথ্যাপ্রাণী   প্রজ্ঞাহীন বিচ্যুতি
চিহ্ন করো   সন্ধানে   উর্ধ্বে রাখো   দ্যুতিকে
এই মারীচ   ক্লান্ত করে   শ্রমকে করে   কর্মহীন
এই অসুর   ভিন্ন করে   জীবন করে   যোগহীন
এই দানব   বহুজীবন   অপমানে   ধিক্কারে
করে বিফল,   নিদ্রিত,   করো আঘাত   এর দ্বারে
যখন নাশ   নিজেই ত্রাস   প্রাপ্ত হয়,   তখন জয়
অগ্নিক্রোধ   জলধিতেজ   এই গগন   বলে অভয়

বহুমৃত্যু আজ মুষ্টিমেয় জীবনের কাছে, বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ

ধরণী গর্ভসম্ভূত নেমে এসেছেন উদ্যতকণা, কৃষ্ণনীল আকাশ থেকে

তিনি সংগ্রহ করেছেন কস্তুরীমথিত বিষ, এই বিস্তীর্ণ কুয়াশাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রে

দেখো, নেমে এসেছে লোহিতকালরাত্রি

প্রেতার্ত হাওয়ায় কেঁপে উঠছে যজ্ঞভাক্সূক্ষ্মশাল্মলী

দেখো উজ্জ্বল তমসা থেকে

রক্তকৌষেয়সেনা নারীরা, হাতে তাদের কজ্জ্বলপ্রভ খড়্গ

নিঃশব্দে তারা আঘাত করছে অন্ধকারে

সুখে, লালিত অসুখে, আলস্যে, ভীরুতায়, শাঠ্যে, অর্ধ নিদ্রায়

পবদ্ধ করছে কালান্তক স্ফীতসুখীদর্পীদের তাদেরই শিবিরে

আর ক্রোধ-ব্যাধি জর্জরতার মতো সেই খড়্গাঘাতে

জ্বলে উঠছে বিবর্ণ শাদা, মৃতকৃষ্ণ আগুন, রূপালি লেলিহ

সময় এসেছে, উৎসব   অর্কসোম বহ্নিমণ্ডল

বাসনাস্ফুরিত মহাসব   স্তোকোৎসার কল্পচঞ্চল

আগতা নবীনা, তাঁর মুখ   পদ্ম, আর রক্তজবা বুক

সুনীল বিজন তাঁর ধ্যান   বজ্র তাই অস্ত্রে নির্ঘোষ

প্রমাদবশতঃ অজ্ঞান   প্রাপ্ত হবে চরম আক্রোশ ।

প্রশ্ন করবে, কেন? কেন তিনি এলেন এখন, পৃথিবী যে আজ

ক্ষয় মৃত্যু আশাভঙ্গে প্রতীক্ষাবিহীন ক্লান্ত । কতোদিন

প্রার্থনায় গেছে, কতো মৃত্যু থেকে গেছে প্রতিকারহীন । তিনি বলবেন,

হে মনুপুত্র, তোমাদের চরম ব্যর্থতার দিনে আমি লই সুকল্যাণী,

কেবল যখন তোমাদের বিজ্ঞান বিক্রয় হয় শিল্পে আসে আসুরিক

দম্ভের কৌশলজাত অনাগ্রহ, করুণার পণ্য হয় তোমাদের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠতা,

তখনি সময়, আমি আসি । হানো অগ্নি, করো জলোৎক্ষেপ, এই বায়ুতে

ফুৎকার দাও, মধুমত্ত হে লাঞ্ছিত, বধ করো সকল ক্লেশকারণ বীজাণুছলনা, প্রতিশোধকারী আত্মারা বালপুরুদের খেকে দন্ত

প্রতিশোধকামী আত্মারা কালপুরুষের থেকে দ্রুত নেমে আসছে

হীরকঙ্কালদল, তাদের করোটির মহাহীরকদ্যুতি বধ করছে, ক্লেশ, তমসা,

প্রতিপক্ষ কোন পাশুপতের প্রয়োগে হবেনা সমর্থ, জয়ী বিপক্ষে তাদের ।

অভিধা লাঞ্ছিত, করো তবে অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনিরণ, যথার্থ করো ন্যাস,

শুদ্ধ করো নিশ্বাস, প্রতিটি ইষীকা করো মহাধ্বংস,

স্ফুরিত করো লব্ধ জ্ঞানী উন্মাদনা

ললিতবিশদপ্রভা, করুণার্দ্র হে প্রবাহ, মুক্ত তুমি
অরুণাঙ্গরুচিসূর্যে রত্নকল্লোজ্জ্বল হলো সমর ভূমি ।
মৌলিবদ্ধ ইন্দুরেখা
চারুপূর্ণ পত্রলেখা
ললাটে ললিত করো, গাঢ়প্রেমে কালাভ্রাভা বিকচ নীলে
সৌন্দর্য, বিশাল হও, কালাগ্নী-বেদনাহীন এই নিখিলে
প্রলয় পয়োধি জলে
অনির্বাণ যেন জ্বলে
স্তব্ধ হোক হাহাকার, লুপ্ত হোক দুরাচার অতীতে মিলে
শুধু সুখব্যাকুলতা গগনে ছড়িয়ে যাক অসীমে, নীলে ।

ভিন্নাঞ্জনদলগপ্রভ শক্তিহস্ত হে কুমার, কিন্নর
মন্ত্র করো উদ্‌ঘাটন, অদ্ভুতের শান্তি হোক, দুর্বার
রহস্যের গতি হোক লীলারিত কম্প্ররেখা, নির্বার
সূর্যালোকে মাত হোক তৃণদল ও শিশুরা সুন্দর ।

হে সেনা, হে স্বাধিকর্তা
রণপ্রণয়ে পৃথ্বীভর্তা
প্রথম নব-বানীস্মর্তা
করো শ্রবণ
সূচনা হল রণশেষে
বহু শ্রমে বহু ক্লেশে
অসম্ভবে অপল্লবে
হলো ব্রত উদযাপন ।

সদ্যোজাত জ্বালামুখী বহ্নিমণ্ডলে যন্ত্রপুষ্পের রূচিনবীন
কালরাত্রি অপসৃত, এখন চরাচর-সঙ্গী মহাকাল, নয় মলিন

নষ্টপুষ্পে পুর্বস্মৃতি, ভুতবিকৃতমুখী সহাস নদী হয়, ধ্বনিত গানে
শেষ হলো আখ্যায়িকা, বারুণী এলো ফিরে, দাঁড়াল নবতরু মহাশ্মশানে ।

হে কবি, সকরুণ ধ্বনিকে আজ করো আবর্তিত
বীরের উৎসাহে, দ্বিতীয় কথা কাহিনী নর্তিত
হলো হৃদয়মাঝে গভীর স্বর পৃথিবী প্রকাশিত
সকল অরুণিমা রূপমধুর শ্রমে সমর্পিত ।

স্মিতবক্তা, জটিল জ্বালাহীন প্রকৃত সন্ধানে
বর্ণজ্ঞানে রূপগাতির ধ্যানে মহৎ আলোড়ন
যথার্থতা পাক, দৃষ্টি, জাগো সহস্রাব্দের
আনন্দিত করেছে, প্রকৃতিকে উন্মোচিত করো

সমাপ্ত প্রথম ব্যাখ্যা, প্রতিষ্ঠারূঢ় আমি
ললিত কান্তাখ্যা

আমাকে যেতে হবে সঙ্গে তোমাদের, ভিন্ন নয়ন আর আমার আত্মতা
তোমরা যাবে প্রেমে জীবনে সংগ্রহে আমিও নেবো তার সব অজস্রতা ।

শুভমস্তু
পৃথিবী পথিকের
অভিধা তোমাদের অন্য কিছু নয়, তোমরা ছাত্র ও শ্রমিক
জয় করো এই মহদ্ভয় । তোমরা পৃথিবীর প্রেমিক
বিশ্ব বিশালতা তোমাদের, ছাত্র শ্রমিকের
অন্য কারো নয়
কেবল পথিকের
জয়মস্তু ॥

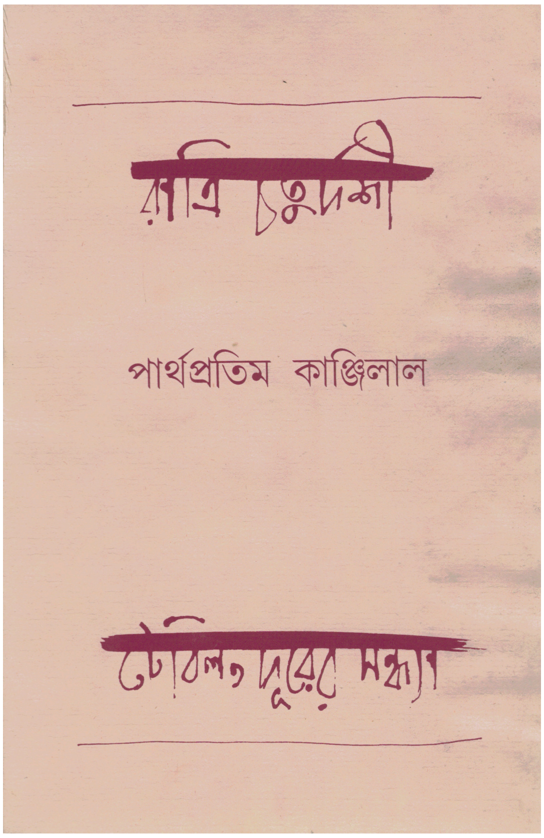
টেবিল, দূরের সন্ধ্যা ও রাত্রি চতুর্দশী

প্রাগ্জ্যোতিষ

ষোলো বছর আগে, 'রাত্রি চতুর্দশী' বেরিয়েছিল । তখন এই গ্রন্থিকাকে 'সনেট সংকলন' বলা হয়েছিল । এই মন্তব্য প্রত্যাহার করা দরকার বোধ করছি । সনেটের স্তবক ও মিলবন্ধের কোম্পানীআইন ভেঙে যে সব উদারনৈতিক সনেট, ত তাদের Quatorzain বা 'চতুর্দশী' বলাই ঠিক - বাংলা ভাষার সনেট শ্রমিক শ্রীউত্তমকুমার দাশ যেমন বলেছেন । নিজের বিশদ বই-টই করা আমার ধাত বা অবস্থাচক্রে ঠিক নেই । অন্তত চৌত্রিশ বছরে হয়নি । প্রকাশকমশায়রা ষোলো বছর আগের 'রাত্রি চতুর্দশী' আর পনেরো বছর আগের 'টেবিল, দূরের সন্ধ্যা' কে, শতাব্দীশেষের বছরে, মনে হয় কোনো এক দিনাবসানের সূত্রকে মান্য ক'রে এক মলাটের ভিতরে নিয়ে এলেন, - পুরোপুরি নিজেদের নির্বন্ধে! কবিতা, কবিতার মুসাবিদাসংক্রান্ত কোনো নির্বন্ধ-উদ্যোগকে ধন্যবাদ দিতে নেই, আমিও দিলুম না ।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

২৩। ১২। ৯৮



তারালেখা

আছি ঘুমে, স্বপ্নে মুর্তি দেখা দেয়, বলে
জলের ভিতরে ডুব দিতে, ডুবজলে
সে রয়েছে । দুহাত নাড়িয়ে তাকে বলি
আমিও রয়েছি ঘুমে, কাক-অন্তর্জলী

আমারও হয়েছে মনে হয়, সে বরং
পারে তো আসুক নিজে; কিছু পথশ্রম
আরো হবে, তবু জলে সে-ই তো অধীরা ।
আমার ঘুমের ফুটপাথের শনিরা

অপরাজিতার ধ্রুব উপমায় রাখা,
আর রক্তজবা গণরাজের পতাকা;
খরা, বন্যা, খরশীত এখানে নিয়ত
পা ছোঁড়ে, প্রলাপ বলে, আর আমিও তো

আছি ঘুমে । - কিন্তু মূর্তি দেখা দেয়, বলে
ডুব দিতে, সে রয়েছে উপরের জলে ।

৪.১.৮৩

এলেজিঃ পশ্চিমবঙ্গ

ছিলেন বঙ্কিমবাবু, ছিলেন রোহিণী,
ছিলো আমবন আর প্রশস্ত দীর্ঘিকা,
বনমন্দিরের মধ্যে, যোড়শীকালিকা ।

আমবন কাটা গেছে, ভেঙেছে মন্দির,

বঙ্কিমের পক্ষে তার নামের কারণে
ন্যায় ও সত্যের দিকে যাওয়া অনুচিত
হয়েছিল জানা গেছে, রোহিণী নিশ্চিত

কোনোখানে নেই, আজ সমস্ত প্রাকৃত
দীর্ঘিকা বদলে তাই থেকে গেছে দিহি
পোড়া মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে

ন্যাড়ামাথা কালী, যার জিভটিও কালো,
দিহিতে কচুরিপানা দৃঢ় সংগঠনে
প্রবল জটিল – দিহি থেকে ওঠে তাপ -
ফাঁকা মাঠে আনমনা সাপ ।

৫.৬.৮২

সমুদ্রহোটেল

কতদিন পড়ে আছি	এখানে, রাতুল
দৈবের প্রবাসবশে,	সিমেন্ট রঙের
সমুদ্রের ধারে প'ড়ে	একাকী, আলুল...
ভিতরে নির্জন শ্বাস	ঝাউয়ের বনের ।

ভাঙা পিলারের কাছে	ভেঙে পড়ে জল ।
হাওয়া তাকে পাঠিয়েছে,	নিয়ম-অধীনা
জলে ভেজা পিলারের	পিচ্ছিলচঞ্চল
শ্যাওলা ছড়িয়ে গেছে	নির্বোধনবীণা ।

কখনো বালির 'পরে	দেখি নীলফুল
বিবাহ সম্ভব, ভেবে	নেয় বন্যপ্রাণ;
সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ রেখে	যায় উর্মিকুল,

সেই শঙ্খে আমিষের,   লবণের ঘ্রাণ ।

উরুদেশে চন্দ্র নিয়ে   জীবতারা নাচে ।
এখনো জ্বলছে স্টোভ,   জানাই পিশাচে ।

২৬.১.৮৩

ট্রেন

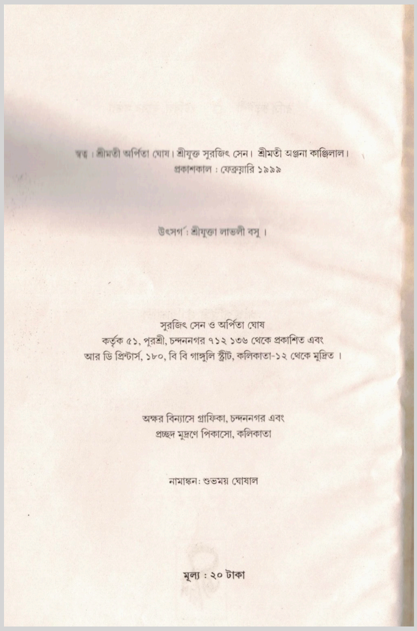
যশোর, সবুজ ট্রেন, তুমি কি এখন
অন্য কোনো বালকের মর্মে এসে পড়ো?
যখের গহনা আগলায় আজ এই
উত্তর-বালক, জড়-স্মৃতি করে জড়ো
অপারগ আচার্যের আঙুলে উন্মন
উপবীত যেন, যার ব্যবহার নেই ।

শৈশব, সবুজ ট্রেন, ট্রেনের সতত
শৈলজল অগ্নিশব্দ, তমসাজীবিতা
যত্নে স্বচ্ছ হলো আজ, তবু পথ-ক্ষত
যশোরেশ্বরীর ভূমে শয়ান কবিতা
আমাকে জানায় কীর্তিনাশা - দূরদেশে
আর্ত পারাপার আজো । ইন্দিয়সঙ্কুল

অতীতে । সবুজ ট্রেন, তরুর অমূল
অন্য বালকের ঘুমে, চুলে ওঠে ভেসে ।

সাগরে

হৃদয়ে ডোবার খল   শব্দে অভিপ্রায়
হৃতসর্বস্বের আরো   কাছে যেতে চায়,
বলে 'বসন গিয়েছে   যাক, দেহ আছে;
বলাৎকারের ধোঁয়া   - আগুনের আঁচে


স্বত্ব । শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষ। শ্রীযুক্ত সুরজিৎ সেন। শ্রীমতী অঞ্জনা কাঞ্জিলাল।
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

উৎসর্গ : শ্রীযুক্তা লাভলী বসু ।

সুরজিৎ সেন ও অর্পিতা ঘোষ
কর্তৃক ৫১, পুরশ্রী, চন্দননগর ৭১২ ১৩৬ থেকে প্রকাশিত এবং
আর ডি প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত ।

অক্ষর বিন্যাসে গ্রাফিকা, চন্দননগর এবং
প্রচ্ছদ মুদ্রণে পিকাসো, কলিকাতা

নামাঙ্কন: শুভময় ঘোষাল

মূল্য : ২০ টাকা

মজার সৎকার হবে, হবে ছায়ারাস,
ম্যাজিক নিশ্চয় হবে যদি হেঁটে যাস
পাবকের' পরে, ঠিক নিয়ম - লাগিয়ে
পা যাতে না পুড়ে যায় আগুন জাগিয়ে ।

যদি ভুল হয়, জানবি লক্ষ্যই আগুন -
যখন যেমন । অর্থ, নিয়ম নির্গুণ ।
পৌরুষ নিতম্ব চায়, বিদ্যুতেরা মেঘ;
প্রৌঢ়সফলতাগুলি চায় যুবামেধ-
অন্তরে সাগর পাতা, তাই অভিপ্রায়
অভাগা হয়েও ফের সমুদ্রেই যায় ।

২৫.৩.৮২

সম্রাট

গোপন ভারতবর্ষ, আমাকেও চাও--
গোঁয়ার জোয়ান খোট্টা হতে বলে যাও
উপদেশ দাও তুমি লোহাচুর খেতে
উড়ে হতে আজ্ঞা করো, আজ্ঞা করো যেতে
পশুশ্রমিকের দলে, রিরংসা-নির্বেদে
পরমতাগুলি সব ভাগ করে নিতে
কেবল তাদেরই সঙ্গে অতি অতর্কিতে, -

কেননা তোমার যুক্তি থাকে তর্কাতীত ।
আমি তা করেছি, দেশ ঈশ্বর ব্যতীত
আর সব কৌতূহল মূলে ভূপাতিত
হয়ে গেছে, সেই সব মরা গাছ কাঠ
হবে রান্নার আগুনে- আগুন, আকাট

সত্য, এই জেনে । আজ   বিদেশের দিকে
সব প্রশ্ন উড়ে যায় লঘু হতে শিখে ।

৩.৪.৮২

স্বর্ণসন্ধান

বাঁকা জিভে হাসে সোনা, পাশে জ্বলে ধূপঃ
“ ভাবছো, এড়িয়ে চলে যাবে? বিশ্বরূপ
এইখানে খোলা আছে আমার অক্ষরে
এ-জন্মের নামটিকে কল্পনার পরে

দেখা যাবে তুমি ছোটো করেছো সততা
দেরি না ঘটিয়ে । ইচ্ছাপূরণের কথা
লপিভুক্ত করে যাচ্ছে। এবং সে লিপি
লিপ্সাতুর নখে টিপছে বইয়ের পৃথিবী।"

তেল তার সমর্থনে ধোঁয়ার বিস্ফারে
তেজের প্রমাণ দিতে তথ্যের আছাড়ে
ঘরবাড়ি পাল্টে দেয়; খাদের কিনারে
ঘটনাপ্রবাহ আর সাংবাদিক বাড়ে ।

যদিও এদেরই মধ্যে, রোগা ও আদুড়
যখ্‌হয়ে আছি, সোনা, অদ্যপি ধাতুর

১৩.১.৮৩

রুদ্রপুরুষ

রূপকথা শুনবে ব'লে,   নাতিনাতনীরা
বুড়ি ঠাকুমার কোল   ঘেঁষে আছে বসে;
রাত্রি হাসে, দশনে কৌমুদী, মাঠে মাঠে
রাত্রি, হাসে বন্ধকীর বুকের করাটে

কোন্‌গল্প তোরা শুনলি,   অবোধ পাখিরা?
রাজপুত্র-রাজকন্যা দানবে-রাক্ষসে
তোদের নতুন ঘুমে   জ্যোৎস্না দিয়ে যাক;
যে আমাকে বলে চলে,   কথা চেপে রাখ্‌,

তোর জানা মিশিয়ে দে   বাদুড়ের ভিড়ে -
অন্ধ বুড়ো পুরুষের   নাভির নিবিড়ে -
তুই তো জানিস,   রাজপুত্রই রাক্ষস
আর রূপকথার কুমারী?   আফশোষ্‌

রাখিস না - সে রাক্ষসী, আছে তার জ্ঞান;
পিতৃগণ পরে আসে, প্রবীণ সন্তান ।

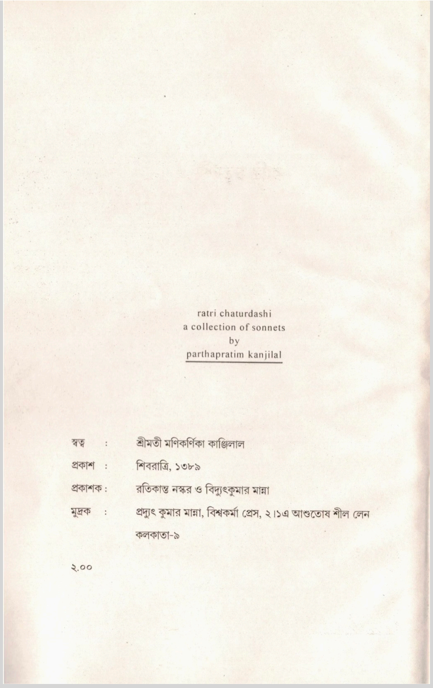
২০.১.৭৭

স্কেল

স্কেলের শৈশব জানে বয়ঃসন্ধি, স্কুল,
পাঠ্যবিষয়ের দ্রুত গম্ভীর কঠিন
হয়ে-ওঠা - সে-ই শুরু হলো প্রশাসন,
প্রতিযোগিতার হ্রেষা, বয়স্কের ঋণ-

যার হাতে থেকে ওঠে পড়ে, সে-ই প্রভু
যার হাতে না-থেকে এমন, সে-ই দাস!
যার লঘু নরম নিতম্বে ওঠে-পড়ে
স্কেল, সে নিশ্চয় শিষ্য আরো কিছু মাস

তাকে বলা হচ্ছেঃ স্পঞ্জ, ঠিক উল্টো দিকে
গুরু ও কঠিন স্কেল, সীমা, যা কম্পাস


ratri chaturdashi
a collection of sonnets
by
parthapratim kanjilal

স্বত্ব : শ্রীমতী মণিকর্ণিকা কাঞ্জিলাল
প্রকাশ : শিবরাত্রি, ১৩৮৯
প্রকাশক : রতিকান্ত নস্কর ও বিদ্যুৎকুমার মান্না
মুদ্রক : প্রদ্যুৎ কুমার মান্না, বিশ্বকর্মা প্রেস, ২।১এ আশুতোষ শীল লেন
কলকাতা-৯

২.০০

তাকে জানো । এ চলে গেলো বাল্যকাল
করতল, মন, চোখ, পিঠ হবে লাল
স্কেলের ঘূর্ণণময় চটাসে নীরবে-
জ্যামিতির খেলা এই । এই হতে হবে ।

২১.৮.৮২

আকাশরথ

মুহূর্তের মেঘে ভ'রে থাকে সব কিছু
এমন কি শহরের পোড়া দিনমান-ও ।
তবু যে কখন, আল্লা, চোখ চলে যায়
উঁচুতে, অথচ জানি ওপর বা নীচু
নেই, সবই পাশাপাশি, আকাশ-ও পাশেই ।
তাকিয়ে দেখছি, কই, নীলিমা তো নেই
কিংবা নির্বিকার নীল নীলেই মাখানো
সংবাদপত্রের মতো রোদে গলে যায় ।
আজ অকপটে বলি, সুবিধানবাদী
আমরা দেখছি শুধু ক্ষুন্নিবারণে
বেলা যায়, বিষয়ের প্রভৃতি-ইত্যাদি
হয়ে বেঁচে আছি, ধরো, প্রায় অকারণে ।
মেঘের মুহূর্তে যদি কিছুটা সময়
পাওয়া যেতো . .. হয়তো, মেঘ একমত নয়!

২৮.৬.৮২

স্পর্ধা

বর্জাইস, তুমি রাখো অভিনিবেশের
উৎসশীর্ষ, উত্তরশিখর । অন্ধতার
বর্জনীয় বিন্দু থেকে স'রে আনো স্মের-

উৎপলকপাল, হাতমালা, গ্রন্থনার -
ধার্য করো । তুমি চাও অণিমাপরমে
কোনো কারণকবিতা, প্রকাশের কূট
ধাবমান হুতাশনে অক্ষকরপুট--
কম্পোজিটরের কামী তীক্ষ্ণচোখ শ্রমে ।
চোখেরই সামনে তুমি নিহিত গুহায় ।
শক্তির বিনয় দেখে, মোটা হরফেরা
চমকে পাংশু হয়ে নানা অসুয়ায়
শলাপরামর্শ করে, কচাল, বখেড়া,

বিজ্ঞাপন ধ্যেয় জেনে বিদ্রুপের জোটে
বিবৃতি ছড়ায় । তুমি আছো ফুটনোটে ।
২২.১.৮৩

কন্দর্প

তখন ছিলেন নববস্থের যৌবন,
লোকযাত্রা চেয়েছিল ইন্দ্রিয় জাগুক,
তরুছায়ে কাঁচাকন্যা, মায়াফলরঙ,
লঘুজলমেঘ ছিলো আচমনোম্মুখ ।

নশ্বরতা কিন্তু ছিলো । তার উৎপাটন-
বিষয়ে, অতীতে কিছু ভাবিনি বিশেষ;
নগ্নতাচূড়ান্তে তার ধীরপ্রশাসন
বিন্দুবিন্দু বিষে রাখে বুদ্বুদনিমেষ ।

গলন্ত মাথার ঘিলু রাখি যৌনবীজে,
সন্তপ্তসাহসে ক্রুদ্ধ, মত্ত, রক্তত্বক,
সমভঙ্গ হতে আর পারবো না নিজে,
গতাসুকে বলিঃ তুমি তাপের নির্মোক ।

বাধা যে আমার, তার এই বিবরণঃ
বাঞ্ছাতরুতলে কন্যা, হৃচ্ছায়াবরণ ।

২৮.১.৮৩

বিগ্রহ

জঞ্জালের পাশে গঙ্গা চিদ্ধর্ম উপুড়
ক'রে দিয়ে পড়ে আছে; ফুলছে জঞ্জাল
জঙ্গমতাবশে, অল্প । কাকের বাহুর
কোণ জঞ্জালের মধ্যে, এই চিত্রচাল

নিয়ে অনুমান করিঃ কাক খোঁজে পাল
বস্তুনিচয়ের--এই সংগ্রহপৃথিবী
নশ্চিতই তার মনে হয়েছে জাহাজ;
কেননা কাছেই ধোঁয়া ওঠে নাজেহাল,
বড়ো হতে থাকে রসে, তাপে, জাঁহাবাজ ।

জঞ্জালঘাটের গঙ্গা চিদ্ধর্ম-উপুড়
গ্রাস মেলে পড়ে আছে, ভাসে খড়-চাল
জড়ানো বিগ্রহমূর্তি - কাক দেখে দূর
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছে শৃগাল ।
২৭.১.৮৩

রাত্রি চতুর্দশী

নিশির গ্রহণে-দেখা পূর্ণনষ্টা সবুজ ডাবের
অজগর পুরোহিত ব্লেড ঘষে বুকে । দুরাসদ

মাংসের মীমাংসা, সারিবন্দী শনি, পাশে প্রস্রাবের

জলজপ, সর্পপ্রজ্ঞা, গোমেদরঙের কাঁচমদ
চন্দ্রকান্ত চরসের ধূম, ঘুম ভৈরবীনাভির

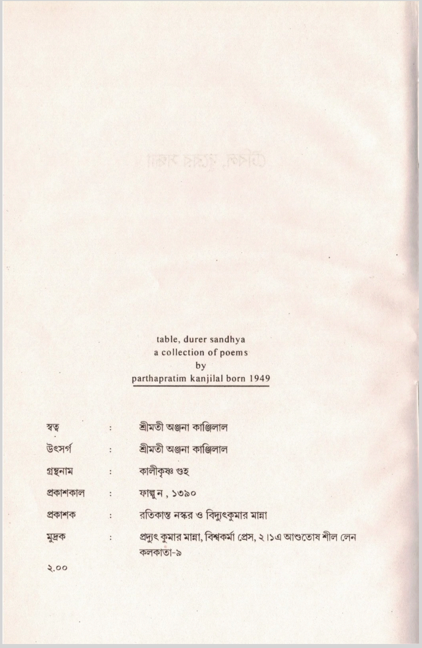
আজ্ঞা, আজ্ঞা । ঈশ্বর, তোমাকে জানি মলমূত্রবৎ ।
বিপরীতপ্রসূতিসদনে, বাচ্চার চিতার কাছে
রূপোর খাঁড়ারা ওঠে, গর্ভগর্ত, নড়ে জিহ্বাজিভ,
উরুব্যাদানের পল্লী, কঁহি ধুঁয়া য়ঁহা নাচেনাচে

আউয়া আউয়া । জুয়া খেলে যোনিগুহাসর্পশিব,
প্রচেত হাউই বলেঃ আমার বাপের সঙ্গে শো, মা ।
ব্রহ্মবাহিনীর জলে, চক্রে প্রণবচতুর । দোষী
হিম, শব নেই । অগ্নি, কবি আছে । রাত্রি চতুর্দশী

৮ ও ৯.৩.৮৩

রাত্রি চতুর্দশী/ সনেট সংগ্রহ/ ১৯৮৩

টেবিল, দূরের সন্ধ্যা



table, durer sandhya
a collection of poems
by
parthapratim kanjilal born 1949

স্বত্ব	:	শ্রীমতী অঞ্জনা কাঞ্জিলাল
উৎসর্গ	:	শ্রীমতী অঞ্জনা কাঞ্জিলাল
গ্রন্থনাম	:	কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রকাশকাল	:	ফাল্গুন, ১৩৯০
প্রকাশক	:	রতিকান্ত নস্কর ও বিদ্যুৎকুমার মান্না
মুদ্রক	:	প্রদ্যুৎ কুমার মান্না, বিশ্বকর্মা প্রেস, ২।১এ আশুতোষ শীল লেন কলকাতা-৯

২.০০

পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি

সে এখন ভুলে গেছে, তাড়ি খেতে সে এসেছে বাঁকুড়ার রাঙামাটি পথে ।
মদ, মদ, ঘোর গাঁজা, পোড়ামাটি-আকাশে ছড়ানো মদরং
পশ্চিমী গরম হাওয়া, শুধু এর মধ্যে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়েছে

বাইরে- গাড়ি না, লোক; যে সব পুরুষ দেখতে আর কখনো সুন্দর হবেনা
তাদেরই মুখের মতো গাড়ি, অথবা গাড়িরা দেখতে তাদেরই মুখের মতো-
সমাধান প্রায় অসম্ভব, সমাধান হয়, তাড়িবেচা কিশোরীকে দেখো,
ও যে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো মরা-খড়ে ছাওয়া হেলে পড়া বাড়ি

বাড়ির ভিতরে গাড়ি চলে, খাকি ও সুরকি ওড়ে, খশে লালমাটি
উল্টেপড়া পান্তাভাতে পেঁয়াজ চকচক করে, লণ্ঠনের আলো
কিশোরীর মুখে বম নেশাভরা বসন্তরোদের মতো লালচে করেছে

গাড়িদের আওয়াজের মধ্যে পশ্চিমী তুখোড় খিস্তি,জয়ধ্বনি,
জানালার ফাঁক দিয়ে যে সমস্ত গাছ দেখা যায় তারা সকলে
শিমূলডালের মতো কিশোরীর উরু সরে যায়, জয়হ্রেষা,

এ বছর কোনো বৃষ্টি নেই, কোনো বছরেই কোনো বৃষ্টি নেই,
ঘামতে ঘামতে তার নেশা নেমে যায়, বোঝে, সে রয়েছে পশ্চিমবাংলায়
যেখানে পল্লব নেই, শুধু আত্মহত্যার রাঙা, রাঙা ভয় আছে

১৯৭৯

বন্ধু

আমরা তার ঘরে এলাম । বাইরে তার সাইকেল দাঁড় করানো । ঘরে
বিদ্যাসাগর আর ব্রুসলীর ছবি, বুকর্যাকে আইন, হিসাবশাস্ত্র,
প্রবন্ধ, পদার্থবিদ্যা, কবিতার বই- মাঝখানে একটা দুটো পর্ণোগ্রাফি ।

র‍্যাকের নীচেই মুগুর, বুলওয়ার্কার, তাস আর ঘুড়ি
বালিশের তলায় কন্ডোম, টাকা, চাবি, একটা প্যাকেটে
সিদ্ধি, খাটের তলায় কল্কে, এককোণে একটা মদের বোতল;
টেবিলে ডায়েরি আমরা খুলে দেখলাম, বেশ কিছু হিসেব, ব্যক্তিনাম,
দু-একটা ঘটনা লেখা – 'আজ এতো জ্যোৎস্না ছিল যে ওসব কিছু
ইচ্ছে করেনি' 'মেয়েটা এতো বাচ্চা আমি বুঝছি কিন্তু গরম হয়ে
যাচ্ছি' 'আজ মনে হলো ঈশ্বর সত্যি আছে' 'আজ বুঝলাম
ভগবান ফগবান ফাঁকি' 'জাহাজে ক'রে বাইরে যাবো'
ড্রয়ারের মধ্যে একটা প্যাকেটে তার পাসপোর্ট সাইজের ছবি
যা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় লেগেছিল । ছবিতেই
দেখা গেল তার একসারসাইজ করা চোয়াড়ে চোয়াল
আর ধূমপানে বসে যাওয়া গাল

এসব আমরা আগে দেখিনি । এখন দেখেছি, কেননা সে
মৃত্যু, কিংবা অন্য কোনো কাজে ঠিক এসময় আমাদের মধ্যে নেই

১৯৮১

শক্তি

মাঠটি উদাসী, ছোটোখাটো জ্বলা ঘাস, মাটিতে কখনো চিড়
একপ্রান্তে ছোটো বন, ঝুপসি পাতার অন্ধকার, দু একটা পোকা ...
আমি ওই দিকে যাবো, মাঠ আমার পক্ষে বড়ো বেশি, এই মাঠে
আকাশের দিকে চেয়ে যদি সব নির্মোক খসিয়ে শুয়ে থাকি
তাহলেও কেউ আসবে না! বরং বনের দিকে যাই,
ওখানে রোমাঞ্চ নেই, অরণ্যে রোমাঞ্চ থাকে, ওখানে বিলাপ
খুব ক্ষীণ, নিরক্ষর তান্ত্রিকেরা ওইখানে আসে ।

ও কার কালো পা? এতো মানিয়েছে
যে, কোনো শব্দ করতে রুচি হয় না । মিশে গেলো এইমাত্র ।
হয়তো পুরাণপ্রিয় এই মন বন্য কালীকে দেখলো ।

আর কিছুক্ষণ পর মাঠ নেই, পাতা, ডাল, শিকড়, শব্দেরা
ছোটোছোটো - ওদিকে বোধহয় কোনো মাঠ, যাই হোক, যেতে হবে,
মাঠের রোমাঞ্চে বেশ সময় কাটলো, এবার ধরতে হবে বাস
ছোটো নালামতো, তা-ও পার হওয়া গেলো

সে খাচ্ছে, যেভাবে
সারাদিন রোদে খেটে-আসা নারী খায়; যদিও সে
খাচ্ছে রক্ত, মুখে কোনো শোক বা আনন্দ নেই, দিব্যতা-ও নেই
নালার এপাশে ব'সে ক্ষুন্নিবারণের জন্যে স্পৃহাহীন মুখে
রক্ত খেয়ে যাচ্ছে । একবার আমাকে দেখলো

বাসগুমটির কাছে এসে আমিও চা খেয়ে নিই এরপর ।

১৯৮২

কবি

মহাস্থবির জাতক যিনি লিখেছিলেন তার শেষজীবনের বাড়ির সামনে
রাধাকৃষ্ণের মন্দির ছিলো । মাঝখানে রাস্তা, সেই রাস্তায় প্রথম দুমুখো সাপ
দেখি সাপুড়ের কাছে । সাপুড়ে হেসে বলেছিল – এ সাপ তেড়ে গিয়ে কাটতে
পারে না কাউকে ।

হতবুদ্ধির চোখে সাপ দেখেছিলাম সেদিন, আজ যেমন নিজেকে দেখি । আজ
ঐ রাস্তা দিয়েই রোজ আমাকে যেতে হয় । দুমুখো সাপের জীবন আজ
আমারই, আজ আমি জেনে গিয়েছি আমার বিষ না কামালেও বিধাতার চলে
যায় । হয়তো নিজের বিষে নিজেই মরে যাবো একসময়, ভয় হয়, যদি আত্মা
থাকে, পুনর্জন্ম থাকে, যদি পুনর্জন্ম নিতে এমনই কাড়াকাড়ি পড়ে আত্মাদের
মধ্যে - কী হবে আমার । তবু মৃত্যুময়ূরের রূপ মনে প'ড়ে কিছুটা আহ্লাদ
হয় - নিশ্চয় সে একদিন উর্দ্ধে তুলে নেবে । সেসময় তাকে কি বলতে পারবো
ময়ূর, তোমারও যে মৃত্যু, সেই আশ্চর্য চিতাবাঘের পায়ে জড়িয়ে গিয়ে-
কামড়াতে পারিনি - কিন্তু দৌড় করিয়েছিলাম তাকে দিগন্তের পর দিগন্ত,
থামিয়ে রেখেছিলাম তাকে স্তব্ধতায়, নিজেরই চারপাশে ঘুরপাক খাইয়েছিলাম
তাকে নির্জনে! এর বেশি কিছু করার ছিল না আমার - যাকে ব্যর্থ বললেও

অন্যান্য ব্যর্থদের অবমাননা করা হয় আমি ছিলাম সেই দুমুখো সাপ!

১০.৮.৮২

বাল্যকালের প্রথম বেশ্যা

ভোর চারটে, উত্তর কলকাতার সবুজ লাইটপোস্ট তখনো জ্বলছে, রিকশায় আমি-মা-বাবা, মিনার্ভা থিয়েটারের পাশের গলিতে রিকশা এসেছে, আমরা চলেছি গঙ্গাস্নানে - হঠাৎ সে, সেই আলুলকুন্তলা বিস্তির্ণসিদুঁর নকশাপেড়ে শাড়ি পলার-রুলি সোনার বালা একবার তীব্র চোখে তাকিয়ে দুর্ঘটনার মতো ভেঙে পড়লো রিকশার পাদানির ওপর। মা একবার দেখে চোখ বন্ধ করে ফেললো, রিকশাওলাটা চ্যাঁচাতে শুরু করলো, বাবা কি বলে উঠলো শুনতে পেলাম না, সমস্ত শরীর দিয়ে তখন একটা শব্দ উঠছে নামছে, এ-এ বেশ্যা, এ-ই বেশ্যা! ‘আরে এ রাণ্ডি, হট্!’

‘না গো,যাবো না-আ, যাবো না-আ, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো - আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো!’ মদপেঁয়াজের অতিপার্থিব গন্ধ মিশিয়ে, সে এই কথা কটি বারবার বলতে থাকে । তাকে ঠেলে সরিয়ে রিকশা ভোরের নদীর দিকে এগিয়ে যায়, আর ধাক্কা সামলে নিয়ে সে একটা নোনা দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়ায় - সেই শেষ-নিশির নারী তার চুলের কালো বিদ্যুৎপুঞ্জ দুলিয়ে চিৎকার করতে থাকে: ‘ইঃ ইঃ, আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন!! স্যোন্, বাড়ি আমি যাবো না! আমি এখানে র‍্যালা করবো-বুঝলি-ই-ই?’

কেউ জবাব দেয় না । সহসা সমস্ত দিক নিঝুম হয়ে আসে । কান খাড়া ক’রে আমি শুনি, সে নিরভিনয় ভাষায় বলেঃ বাড়ি আমি যাবো না ।

১৯৭৭

বন্ধুদের

তেমন চোখের জল আমার ছিলো না কোনোদিন
জলের ভিতরে চোখ ভেসে গিয়েছিল
জলের ভিতরে চোখ বহে গিয়েছিল,

জলের ভিতরে চোখ বাষ্প হয়ে শূন্যে উঠে মেঘ হয়েছিল

জল সব দ্যাখে, এই জেনে । আমার আগুন আছে, অন্ধের আগুন
ধ'রে আছে জিভ-কণ্ঠা-হাত-উর্ধ্ববুক ।
আগে, তা নিভুক ।
৪.৫.৮২

নৈশ

রাত প্রায় দশটা, পাথর এখনো তেতে আছে
মড়া পুড়ছে যমুনার ধারে
শানের ওপরে ব'সে পুরুষযৌবন, গাঁজা হাতে, পাশেই মিঠাই
পাশে খোদা, মুহব্বত, বন্দ্লা নেওয়া, ঘানি
নদীর দুদিকে ফ'লে আছে অন্ধকার অনেক তরমুজ
মড়া পুড়ছে, দুএকটা ফুলকি উঠছে, পুড়ে যাচ্ছে একসেকেণ্ড আগের সংসার
ফুলকি উঠছে, কাছেই তাজমহল, আর
যমুনার ধারে ধারে ফ'লে আছে আঁধারের অনেক তরমুজ

১৯৭৯

নিয়তি-নিশীথ

আভ্যন্তরীণ তেল, ডুবোপাথরের
আক্রমণে ছুটে চলে জল;
ঘোলা, উন্মাদনাময় সেই পীড়িত নিশীথ
স্বপ্নের আপৎ-ধর্ম, আজানের অন্তর্গত অন্যমনস্কতা ।

৯.৮.৮৩

মধ্যমা

কনিষ্ঠা, অনামিকার মতো
মধ্যমা প্রণয়মূঢ় নয়, নয় বুড়ো আঙুলের
মতো তির্যক ব্যক্তিতা, তর্জনীর তারাপ্রীতি

নেই তার, এজন্যে সে নেতা,
সাপের একাগ্র খিদে তাকে সব থেকে দীর্ঘ করেছে;
সাপের পুরাণ তাঁকে মন্থনের মন্ত্রণা দিয়েছে;
কিন্তু মানবের রাশিচক্রের আঙুল
গতিবৃত্ত মেনে, তাকে, পাশে ও নীচে-ও পাঠিয়েছে ।

৯.৮.৮৩

কর্মের শব্দ

গৃহডাকিনীর জিহ্বা, শিশুর উলঙ্গতা আর
ফলের নির্বাক অম্ল থেকে, আলো
ঋণ নিয়েছিল কিন্তু ফেরৎ দেবে না;
আলো তাই কর্তৃবাচ্য, শুধু তার ক্ষীণ অনুতাপ, অবসর
নাতিশীতোষ্ণতা পেলে সময়, প্রাণিকূলের
মধ্যদেশে-থাকা শুক্রের অব্যয় সরস্বতীটির
কাছে আসে, এই দৃশ্যে প্রেতলোক সন্তুষ্ট হয়েছে;
কেননা কলসী, বাঁশ ভূতলে গড়ায়
স্রোতগুলি আবাহনে মদপান করে, আর বিসর্জনের সিদ্ধিতে
কোথাও নিজেই ডোবে তারা : পৃথিবী-ইথারে
চাল ফুটবার মুগ্ধ শব্দ লেগে থাকে ।
১৩.৮.৮৩

প্রকৃতি

মলিনা এই সংসার, এর কারখানাগুলি ধূমাবতী;
মৃতদের সূক্ষ্ম আক্রোশ
এখানে যুবকদের আরো প্রগল্ভ করেছে;
প্রগল্ভতার সেই সবুজ পল্লবগুচ্ছে
সূর্য উঠলে সরষের তেল লাগে, সঙ্গে-সঙ্গে

বহির্দেশের এক কিংবদন্তী-বাঁশি
তাকে-ও সুনীচ করে, অথবা গভীর ।

৯.৮.৮৩

নির্ণয়

মাটি তো তেমন নেই, কিন্তু ভূমি আছে;
পশুর মতো প্রিয় লোকজন, কবিতা রচনা ।
আলোই ক্লান্তির যজমান ব'লে
আলো মাঠ, ধ'রে নিতে হয় ।
মাটি, এখনো বাঙ্ময় ততো নয়--
ধুলোবালি, ভাবপ্রবণতা
এসব রয়েছে তার; মাঠে পশু গেলে
আকাশে তখন দৃষ্টি যায়; নির্ণয়েচ্ছু সেই পলায়ন ।

৯.৮.৮৩

সকাল সাড়ে নটায়

অনবরতই তুমি পালাচ্ছিলে যেভাবে বেড়াল পালায় বালকের কাছ থেকে কার্ণিশের পর কার্ণিশ টপকে - এমন কি খবরের কাগজেও তুমি এক কবির মৃত্যু উপলক্ষে চিঠি ছাপানোর সামাজিক দায়িত্ব ধরে ফেলতে চেয়েছো । দাঁত মাজোনি অনেকদিন যাতে দাঁতের যন্ত্রণা হয় । ভাবোনি প্রত্যেক বাড়িতে একই বালক । আজ খরার পর বৃষ্টি নেমেছে - পৃথিবীতে যেরকম হয় । তোমার মনে পড়ছে বাচ্চাবেলায় পড়া সেই ওয়েস্ট ওয়ার্ড হো, সেই বৃষ্টিহাওয়া-ঝড়-সাগরের মধ্যে টালমাটাল জাহাজ যেখানে প্রেমিকদের পুড়িয়ে মেরে ভাবা হচ্ছে হয়তো নিরাপদ হওয়া যাবে । তোমার স্কুলের বই ছিলো 'পৃথিবীর পরিচয়', যার মলাটে সমুদ্রের ছবি কিন্তু বালুকাবেলা ছিলো না কোথাও । আজ খরার পর বৃষ্টি নেমেছে, আজ বিপর্যস্ত সাড়ে বত্রিশ বছরে তুমি মেনে নিচ্ছ অনন্তে সমস্ত এক, গোলাপ, আগুন, কাদা, ধূপ, অভ্র ও মরিচা সবই । একটু বাদেই তুমি লাফিয়ে উঠবে অফিসের দিকে, অর্থাৎ, আবার পালাবে, দুর্ভাগ্যের জন্যে খেদ নিয়ে মুখে

হাসি ফুটিয়ে ব'সে থাকবে – কেননা যে কোনো বন্ধুযুগলের মতোই, আমাদের মতের মিল খুব কম সময়ে হয়েছে । বেড়ালের মতোই একদিন নির্জনে সবাইকে ছেড়ে দিয়ে তুমি মরে থাকবে, আমার এই শুভেচ্ছা রইল । সমুদ্র সেদিন তোমার থেকে চার পা দূরে থাকবে, তুমি বালুকাবেলায়, পৃথিবীর পরিচয়ের একেবারে প্রান্তে । যাও, পালাও এখন ...

২৮.৭.৮২

কেন যামিনী

সবটাই জৈবতা এমন ধরতে অসুবিধে হয় । পঁচিশ/ছয়/পঁচাত্তরের রাত মনে পড়ে – সে বেশ রাজনৈতিক রাত, সে এক ফেমিনিন ইমারজেন্স, তবু সাড়ে-এগারোটায় আলো নেভাতে, একটু বাদেই লম্বা অনঙ্গযন্ত্রণা । গৌতম, তখন তৈরি হওয়া গিয়েছিল সুনির্দিষ্ট কামপ্রবণ জীবনযাপনের জন্যে - যা-ই করি না কেন, কিছু যুক্তি - কিছু উন্মাদনা তো সংগ্রহ করে নিতে-ই হয় । দিন তিনচার বাদে প্রেত এবার কামড় দেয় বুকে, গলার কাছাকাছি । প্রেম আসে, গরম জলের মতো টগবগ করে প্রেম ফোটে, যে প্রেম গরাদ ধ'রে চাঁদ, আকাশ মেঘ দেখার পক্ষপাতী, যে প্রেম বাতাসের বীজন চায়, গান চা'য় । কয়েক ঘণ্টা বাদেই শূন্যতা । আবার হঠাৎ একদিন মূলাধারে কামড়ায় প্রেত, দুধ গরম হয়, যে গরম শুধু দরজা বন্ধ ক'রে দিতে চায়, ততোটা বাতাসপ্রিয় নয়, গান চায় না সেই উথলে ওঠা লাল ঘনশ্বাস । সবটাই মনের কথা, হয়তো হর্মোনেরও, তবু গৌতম, প্রেতের কামড় আমি টের পেয়েছি । রাত প্রেত নামায় । রাত আমাদের নিয়ে কী করতে চায় তুমি জানো গৌতম? সহবাসের ভিতর দিয়ে সবসময়েই দেখেছি যে লিপ্ত হচ্ছে সে প্রেত, ইয়ার্কিবাজ অথবা আর্ত, সে আমরা নই । হাওয়ার থেকে বেশি পাষাণ আমি দেখিনি ।

১১.৭.৮২

বিরহ

মাঝে মাঝে আমাকে বেপাড়ায় দেখা যায় । বলা দরকার যে পুরুষদের বেশ্যাগমনে যেহেতু সমাজের মৌন সমর্থন আছে, সেই কারণে, এই অঞ্চলকে আমার নিষিদ্ধ মনে হয়নি; এছাড়াও, অভাবীদের সঙ্গে যৌনতা হয় না -

খ্যাতিহীন কবিদের স্ত্রীরা প্রায়ই যা বুঝে ওঠেন । তা-ও, আমাকে এই যৌন পল্লীতে বা সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায় ।

মাঝে মাঝে দুটি একটি স্বভাবী রমণী এসব পাড়ায় আসে । একবার একজনের খবর পেয়েছিলাম, আর দশটি ভিন্নভিন্ন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় যুবকর্মীদের পাঠিয়েছিলাম তার কাছে । পরে নিজে তার কাছে যাই । সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি ।

খুব জেদ নিয়ে জানতে চাই – শুধু জানতে চেয়েছিলাম দশজনের তফাৎ কী কী । কে কীভাবে । কিন্তু, সে এমনি ধূর্ত যে খালি সঙ্গম করতে চায় । প্রায় দেড়ঘণ্টা কাটিয়ে কথা না বার করতে পেরে উঠে আসি চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে আঁচ করি যে ওসব করলে হয়তো তারপর জানা যেতো - যদিও, লিপ্ত হ'লে জানতে ইচ্ছে না-ও করতে পারতো, সে সম্ভাবনা-ও ছিলো

আমি পরে তাকে পাইনি, জায়গা বদলেছে । কিন্তু তারই মতো কাউকে আমি খুঁজছি - আরিয়াডনে, তোমার কাছ থেকে এ উলসুতো না পেয়ে ভারতবর্ষের গভীরে যাবার মতো পুত্রতান্ত্রিক আমি নই, আরিয়াডনে, যদি দেখা না দাও, সুতো না দাও, আমি এই জীবন নিম্নরাজনৈতিকতার সিন্ধুবালির গর্তে থেকে যাবো ।

২৮.৫.৮২

আরো রাতের কবিতা

বাঁশঝাড় পাশে রেখে, লরী ও মোটর যায় তারাদের দিকে
ড্রাইভার জানালায় এসে দেখে, কোথায় রয়েছে ছায়াপথ

তার
ধীর হাসি; বহু বছরের চাকরির ইস্তফা জমা দিয়ে
মানুষ যেমন হাসে । মনে পড়ে, জল নিতে হবে । কাছাকাছি
পুকুর আছেই ।

বাঁশঝাড় পাশে রেখে, লরী ও মোটর যায় তারাদের দিকে
পুকুরে তারার ছায়া, কোথাও যাবে না!

১৯৭৮

টেবিল

টেবিল, দূরের সন্ধ্যা
ঘনিয়ে আসছে । ফল, মৃতদেহ
অফিসফাইল, জোড়া-খোয়া দুল
নেগেটিভ প্রিন্ট, অ্যালবাম, প্যাড

কি রাখবো তোমার উপর?

চেয়ার, রাখতে হবে সামান্য সরিয়ে

২০.৮.৮২

প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩৯০ -মার্চ ১৯৮৩



শাদা পাথরের গোলাপগুচ্ছ

দীপ

কে উম্মাদ পলাশফুল... পুষ্পরাশি... কেন গন্ধহীন
যখন স্রোতাবর্ত ছিলো তখন কি স্বচ্ছতা আসেনি ।
এখন, শুধু বহন করা । ... সর্পিল ধূপ পুড়ছে, ঘুরছে...
দাঁড়িয়ে রয়েছে নম্র আমার পিতলপ্রদীপ, ধাতব ।

৯ জানুয়ারি ১৯৭০

ভ্রমর

একটি ভ্রমর কিন্তু একদিন চেয়েছিলো মধু
এমন তরুর থেকে, যে আকাশ-মূল

মাটির ভিতরে আজ স্তব্ধ সেই ভ্রমরের কাছে
শাখা থেকে উড়ে আসে রাশি রাশি ফুল

এই ফুলে পিতৃগ্রন্থি লেগে আছে, একথা বোলো না -
এই কথা হয়ে যাবে অধিক নির্ভুল

দেবাদিদেব

পাঠককে বলি যে এই বইটা তপোভূমি নর্মদার দ্বিতীয় খণ্ড । প্রথম প্রচ্ছদ
উজ্জ্বলন্ত কমলা
রঙের, চতুর্থ প্রচ্ছদ শাদা, বিটে বই-এর নাম লেখক, খণ্ড,প্রকাশনা কিছুরই
উল্লেখ নেই ।
বইটির পরিশিষ্টে উপমন্যু, এক ব্রহ্মর্ষি,মহাভারতের অনুশাসনপর্বের ষোড়শ
অধ্যায়ে
কৃষ্ণকে বলছেন, মহাদেব বা শিবের এই সত্য, সিদ্ধ ও সর্বার্থসাধক স্তবকে তণ্ডি
ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যলোকে এনেছেন, এই স্তব বেদের মতই উত্তম । এই

অষ্টোত্তরসহস্র

নাম মঙ্গলজনক, পুষ্টিকারী, রাক্ষসনাশক ও পরম পবিত্র । মানুষ যত্ন করে, শুদ্ধচিত্তে এই নাম জানবে ও মনে রাখবে ।

মহাদেবই হরি, গণপতি, কাম, এসবে বিস্মিত হচ্ছিলাম না, এম কী তিনিই অর্দ্দন অর্থাৎ পীড়ন, তাতেও না ; কিন্তু যখন দেখা গেল, তিনিই অধর্ষণ ও ধর্ষণাত্মা 'অধর্ষণো ধর্ষণাত্মা যজ্ঞহা কামনাশকহঃ' । তখন আমার স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে পড়া মন ভাবতে চাইল এই ধর্ষণের অর্থ নিশ্চয়ই রমণীধর্ষণ নয়, এবং বাতাস হঠাৎই হেসে উঠলেন, উত্তরপশ্চিম ভারতের অতিপ্রাচীন পাথর মন্দিরদের ছায়া দেখতে পেলাম সেই বাতাসে শেষপর্যন্ত, ল্যাকারিং করার জন্য চিকণ শাদা ও চিকণ আগুনকমলা রং প্রচ্ছদ ছাড়া, আমার জানবার কিছু থাকলো না ।

২৫.০৯.২০০৭

ভাস্করদা, আপনাকে

আপনার সঙ্গে আমার আলাপ উনচল্লিশ বছরের,
সেই ছেষট্টি সাল থেকে; আপনার কলমকে
তখনি সমস্ত লোকে জানে । আমাকে আপনি
বিশ্বস্ত বন্ধু বা সমর্থ লেখক হিশেবে কখনো ধরেননি,
তবে আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন কফির টেবিলে,
ছোটো চায়ের দোকানে ।
কিন্তু আমি আপনাকে ভালোবাসতাম
সঙ্গী, বন্ধু, লেখক হিশেবে । আপনার সঙ্গে কথা বলতে
গ্লানিবোধ করিনি কখনো ।
জেমস করবেট যেমন হিন্দু না হয়েও আদর্শ বৈষ্ণব,
আপনি চক্রবর্তী হয়েও তেমনই এক আদর্শ খ্রিস্টান,
আপনার প্রত্যেক শব্দে বিশপের রুপোর মোমবাতি
চলতো ফিরতো - আপনার আড্ডার শব্দে: ও হ্যাঁ, চিঠিটা
আমি যে কারণে লিখছিলাম,
২৩শে জুলাই ২০০৫ তো ঐসব হলো; আমি ভাবছিলাম

কতোদিন কথা হলো, ঠিক নিজের ভাষায় আপনাকে আপনার
লেখার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, বলা হয়নি, ভাস্করদা
বাঙালি লেখকদের মধ্যে আপনি সব থেকে উজ্জ্বল শাদা ।
এমন সময় ফোল্ডার নিয়ে অন্নপূর্ণা ও শুভকালের গৌতম বসু
আমার কাছে এলেন - আমরা দুজনে একসঙ্গে আপনাকে শেষ দেখি
ফোল্ডারে থাকা আপনার শব্দাবলী আবার দেখলাম,
সব শাদা পোখরাজ, ভাস্করদা, একচুল বাড়িয়ে বলছি না -
আলো কোথাও বেশি, ছায়া কোথাও, কখনো সোনায় ধরা, কখনো রূপোয়-
কিন্তু সব শাদা পোখরাজ! কি করে যে হলো
বুঝতে পারছি না, শুধু বলছি আর কখনো হবে না এরকম -
এমনকি বাংলাতেও না ।

রাজকাহিনী

এক সন্ধ্যার মধ্যে ভগৎ বর হইয়া গেল । ভগৎ যে ১৯৭১ সালের সিপাহী-বিদ্রোহে যোগ দেয় । বিবাহমণ্ডপেই ফুলশয্যা, অর্থাৎ ফুলে সাজানো একটা বড়ো খাটিয়া । বসন্তকালের বৃক্ষের নিচে সেই শয্যা । বিবাহের পূর্বে ভগৎকে বীরবল নামে আর এক যুবার সহিত লড়িতে হয় বীরবল নাকি এই কন্যাটির প্রতি আসক্ত । শুনিয়া সে বলে তবে তাহার সহিত বিবাহ হোক ! না, কেননা কন্যার ততো আকর্ষণ নাই । বীরবলও জানায় যে সে-ও চায় কন্যাটি সুপাত্র অর্থাৎ দৈহিক পৌরুষে অর্পিত হোক । ভগৎ পঁচিশ, বীরবল কুড়ি - পাঞ্জায় বীরবল হারিয়া যায় ।

কন্যাটি চতুর্দশী, পরণে ছোটো চেলি । সিদ্ধির অন্যমনস্ক আহ্লাদে ভগৎ তাহার দিকে তাকায় । এও এক মানুষ, কিন্তু তাহার সহিত ভগৎ-এর যোগাযোগ হইবে না: তাহারা সমসাময়িক নহে । যৌনসম্বন্ধ ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনো গুঢ় সম্বন্ধ হইবে না জানিয়া ভগৎ হাসে ও একটানে চেলি খুলিয়া অন্যদিকে ফেলিয়া দেয় । দেহ যৌনকৌতূহলে পূর্ণ দেখিয়া পাথুরে দেশের চাষার বলপ্রয়োগ করিতে তাহার দ্বিধা থাকে না । রাত্রি বাড়িতে থাকে এবং চতুর্দশীর একসময় সংজ্ঞালোপ হয় । ইহার পূর্বে চতুর্দশী যেহেতু জানিয়া যায় যে নশ্বর শরীর এইরূপে অবিনশ্বরতা চায়, সে সহজেই বাঁচিতে পারে । ভগৎ কতকটা বিরক্তি কতটা অন্যমনস্কতা ও কতকটা নেশাবিজড়িত যৌনতায় বাঁচিয়া থাকে । তাহার

স্ত্রী সবার সহিত মন্দিরে যায় । মন্দির নির্জন হইলে নিবেদনহীন ভগৎ
মন্দিরের চারিপাশের
মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় ।

ডোম

রসাভিলাষিণী গঙ্গা, বটপল্লব, শিলা, বিষ্ঠা, মালাচন্দন, স্থানীয় মস্তান,
ভিখারি, মৃতদেহ, হরিধ্বনি, জিলিপি, চা, পুরানো কেক, ইলেকট্রিক
চুল্লী,
দেয়ালে চক দিয়া লেখা নাম, খই, কলসী, ছাই, অয়েলমিল, বাঁশ হাতে
চণ্ডালের সুখমুহূর্ত, উড়ন্ত অঙ্গার এবং স্নানকর্তৃক নগ্নতায় নড়িতে-থাকা
রমণী - এইসব উপাদানে যেসকল লেখা আমি তৈরি করি তাহা অনশ্বর
কি না প্রশ্ন থাকে । কেননা, ইহার মধ্যে কফিন ও কবরের সুমিষ্ট
কূটতা নাই । ব্রীজ বা গঙ্গার দূরবর্তী বাঁক অধিকতর কি না,
শ্মশানযাত্রীদের
বিশ্রামনিবাসে ইহা লইয়া আলোচনা হয় ।

আলোচকেরা পটুয়া ।

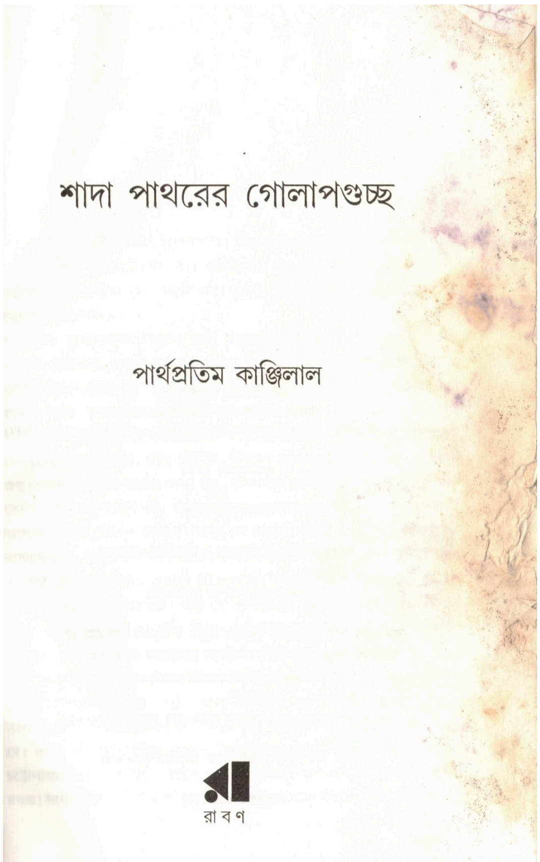
তাসার ভিতরে, আমি, আমার মগ্নতা পাইয়াছিলাম, এখনো পাই ।

অভিজ্ঞতা

পুনর্বসু নক্ষত্রে চাঁদ আসিলে, উত্তর কলিকাতার এক জীর্ণ ছাদ হইতে
তাহার উদ্দেশে বলি, নয়ন, নেত্র, লোচন ও সম্ভব হইলে আঁখিকেও
ফিরাইয়া দাও । চোখ লইয়া আর চলে না ।
চাঁদ আমার সেই মুশকিল আসান ফকির, যাহার হাতে চারু চামর, যে মুশ্লিম
অথচ সকল হিন্দু সংকীর্ণতা যাহাতে নতশির, প্রশ্ন করে - কেন?
আমি জানাই - চোখ চশমা চায় কিন্তু নয়ন, নেত্র, লোচন বা আঁখি ঐ পরকলা
চায় না । চাঁদ ৮৪'রমেঘে ডুবিয়া যায় । মেঘ সংস্কৃত জানে না । আঁখিকেও কি
মেঘ জানে না ? তখনি বিদ্যুৎ, দেখি । যাহা এক আঁখিহীন কটাক্ষ

টেক্কা

কুঁড়ের বাদশাকেই বারবার দেখি
দু-অর্থেই কুঁড়ের বাদশা
যদি রাজনীতির প্রাসাদ আর
প্রাসাদের রাজনীতি ভাবো - যদি রাজনীতির প্রসাদ
আর প্রসাদের রাজনীতি ভাবো
কুঁড়ের বাদশাকেই বারবার দেখি
ও কি শুয়ে আছে? তাহলে তো শোয়াটাও হয়
ও কি বসে আছে? তাহলে তো বসাটাও হয়
আমি তার কাছে বসি, আমি তার কাছে শুয়ে পড়ি!



বাংলায় ভ্রমণ

সুন্দর, মেঘলা দিন, আজ স্বর্গে বেড়াতে এসেছি
স্বর্গে না শ্যামনগরে, ঠিকঠাক বলতে পারবে না
সুন্দর, শ্যামশ্রী দিন, আজ স্বর্গে বেড়াতে এলেছি ।

এখানে মেয়েরা আসে, সালাম আলায়কুম সবার ভ্রূলতা,
এখানে যুবতী দেখে এমন উতল হওয়া যায়
যাতে হরিণের কথা মনে পড়ে, আর বুড়োবুড়ি
কেউ যদি সামনে চলে আসে তবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
ছাড়া কোনো চিন্তা আর এই মাথায়ই আসে না, তাঁদের শরীর,
চলন, কথাও হাসি তিন-পোহর পাক-করা সিন্নিতে মাখানো ।
বয়সে কাজলদোষ, তাই বারোশিবের মন্দিরে
রোয়াকের ‘পর বসে, বয়সে কুঙ্কুমদোষ যাদের হয়েছে
তাদের ভুরুর আর শরীরের সালাম আলায়কুম দেখি ।
মাথায় গোয়ালগন্ধ সঙ্গীরাও একই দোষে দোষী ।
এরই ফাঁকে এক শালা ছোটোছেলে এসে হাত ধরে টান দিল ।
তার সঙ্গে গিয়ে দেখি আরেকটি চেনা গর্ভগৃহে

দোয়া করাতেন যিনি তাঁর খড়মের মতো যুক্তশিব গৌরীপট্ট
উধাও হয়েছে, কিন্ত সিঁড়িতে খড়মদাগ, ছেলেটাকে
বখাবার জন্য আমি বলি আজ মাষ্টারমশাই নিজে স্কুল থেকে
কেটে গেছে, কিছু সেই ছেলের বান্ধবী, ইঁদুরকে দাঁত-দেওয়া পাকা বুড়ি,
ব'লে ওঠে মাষ্টারমশাই ফের চাঁদ আর সুর্য আনতে গেছে ।
সিঁড়ির দুপাশে একরাশ নয়নতারা স্কুল ছেড়ে তবুও যাবে না ।

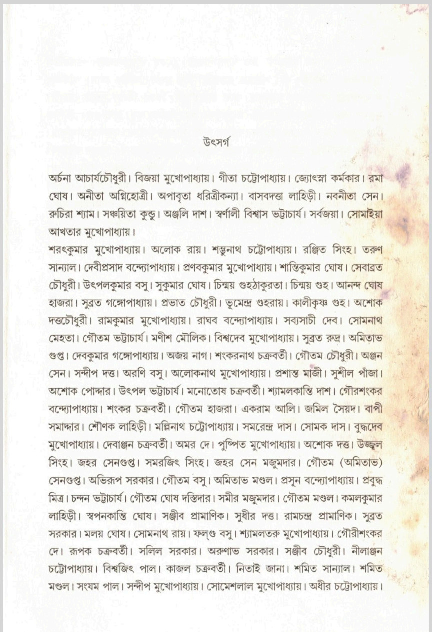
সুন্দর মেঘলা দিন, আজ স্বর্গে বেড়াতে এসেছি
স্বর্গে বা রসুলপুরে, ঠিকঠাক বলতে পারবো না, শুধু জানি আজ
এই মেঘ, ইন্দ্রের আলোয়
শ্যামশ্রীসুন্দরী বাংলা যে যা চায় তা-ই তাকে যা-চাইতে-ভুলে-গেছে তারো
লাবণ্য মাখিয়ে, দিচ্ছে; বোবা কবিদের সঙ্গে ক'রে
এই যথাসর্বস্বের দুয়োরে, অন্দরে, শ্যামনগরে, রসুলপুরে
বেড়াতে এসেছি ।

সুর্যালোকের ইতিহাস

রতিপল্লীতে অল্প আলো ও অনেক অন্ধকার দরকার, যাহাতে
নক্ষত্রের মতো লম্পটেরা আসিয়া অর্গলের ফাঁক হইতে
দেখিতে পায় শয্যায় বেশ্যাদের তারারা শুইয়া আছে...

ঝড়ের গোলাপ

দুইটি গোলাপ পাশাপাশি ছিল । ঝড়ে তাহারা
প্রথমে দুষ্ট প্রান্তে পরস্পরের কাছ হইতে অনেকটা
সরিয়া গেল, ধূসর গোলাপবর্ণ চীৎকার করিয়া বলিল,
'আমি অন্য পুরুষকে সহ্য করিতে পারিতেছি না'
আমি অন্য রমণীকে সহ্য করিতে পারিতেছি না'
ঝড়ের আন্দোলন বিপরীতমুখী হইলে তাহারা
পরস্পর জড়াইয়া গিয়া গূঢ় গলায় বলিতে লাগিল,
'আমি সেই পুরুষের মধ্যেই আমার সত্যকার প্রেমিকাকে

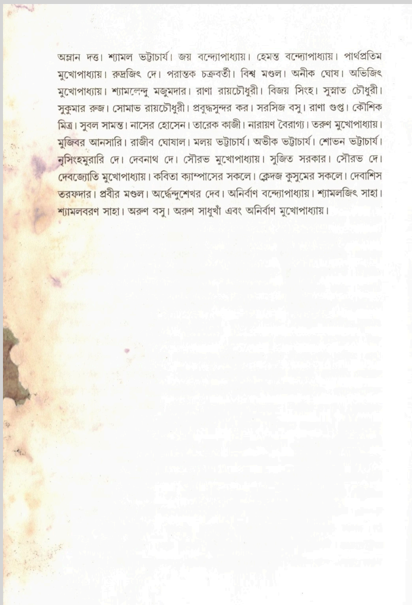


উৎসর্গ

অর্চনা আচার্যচৌধুরী। বিজয়া মুখোপাধ্যায়। গীতা চট্টোপাধ্যায়। জ্যোৎস্না কর্মকার। রমা ঘোষ। অনীতা অগ্নিহোত্রী। অপাবৃতা ধরিত্রীকন্যা। বাসবদত্তা লাহিড়ী। নবনীতা সেন। রুচিরা শ্যাম। সঞ্চয়িতা কুন্ডু। অঞ্জলি দাশ। স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য। সর্বজয়া। সোমাইয়া আখতার মুখোপাধ্যায়।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। অলোক রায়। শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। রঞ্জিত সিংহ। তরুণ সান্যাল। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। শান্তিকুমার ঘোষ। সেবাব্রত চৌধুরী। উৎপলকুমার বসু। সুকুমার ঘোষ। চিন্ময় গুহঠাকুরতা। চিন্ময় গুহ। আনন্দ ঘোষ হাজরা। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। প্রভাত চৌধুরী। ভূমেন্দ্র গুহরায়। কালীকৃষ্ণ গুহ। অশোক দত্তচৌধুরী। রামকুমার মুখোপাধ্যায়। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়। সব্যসাচী দেব। সোমনাথ মেহতা। গৌতম ভট্টাচার্য। মণীশ মৌলিক। বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়। সুব্রত রুদ্র। অমিতাভ গুপ্ত। দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অজয় নাগ। শংকরনাথ চক্রবর্তী। গৌতম চৌধুরী। অঞ্জন সেন। সন্দীপ দত্ত। অরণি বসু। অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রশান্ত মাজী। সুশীল পাঁজা। অশোক পোদ্দার। উৎপল ভট্টাচার্য। মনোতোষ চক্রবর্তী। শ্যামলকান্তি দাশ। গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। শংকর চক্রবর্তী। গৌতম হাজরা। একরাম আলি। জমিল সৈয়দ। বাপী সমাদ্দার। শৌণক লাহিড়ী। মল্লিনাথ চট্টোপাধ্যায়। সমরেন্দ্র দাস। সোমক দাস। বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়। দেবাঞ্জন চক্রবর্তী। অমর দে। পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়। অশোক দত্ত। উজ্জ্বল সিংহ। জহর সেনগুপ্ত। সমরজিৎ সিংহ। জহর সেন মজুমদার। গৌতম (অমিতাভ) সেনগুপ্ত। অভিরূপ সরকার। গৌতম বসু। অমিতাভ মণ্ডল। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবুদ্ধ মিত্র। চন্দন ভট্টাচার্য। গৌতম ঘোষ দস্তিদার। সমীর মজুমদার। গৌতম মণ্ডল। কমলকুমার লাহিড়ী। স্বপনকান্তি ঘোষ। সঞ্জীব প্রামাণিক। সুধীর দত্ত। রামচন্দ্র প্রামাণিক। সুব্রত সরকার। মলয় ঘোষ। সোমনাথ রায়। ফল্গু বসু। শ্যামলতরু মুখোপাধ্যায়। গৌরীশংকর দে। রূপক চক্রবর্তী। সলিল সরকার। অরুণাভ সরকার। সঞ্জীব চৌধুরী। নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বজিৎ পাল। কাজল চক্রবর্তী। নিতাই জানা। শমিত সান্যাল। শমিত মণ্ডল। সংযম পাল। সন্দীপ মুখোপাধ্যায়। সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়। অধীর চট্টোপাধ্যায়।

দেখিয়াছি যে আমার কথা নয়, সংকেত বুঝিয়াই
আমন্ত্রণ করে এবং রমণীর চরম গোপনীয়তার অর্জনে
প্রাপপণ ভুল চেষ্টা করে, আমি সেই পুরুষের মধ্যেই
আমার সত্যকার প্রেমিক দেখিয়াছি যে জানে যে আমিও
রমণী হইতে চাহিয়াছিলাম’
আমি কেন সেই রমণীকেই আমার দয়িত মনে করিব না
আমাকে দেখিয়াই যাহার রমণীকান্তিতে, রমণীদৃষ্টিতেও
পুরুষের অবোধ বনজ সারল্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল
আমি কেন সেই রমণীকেই আমার প্রণয়িনী মনে করিব না
সে কেমন যেন মনে করিয়াছিল ‘আমি এই রমণীহৃদয়েও
ঔদার্য লইয়া তাহাকে দেখিব’


অম্লান দত্ত। শ্যামল ভট্টাচার্য। জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। রুদ্রজিৎ দে। পরান্তক চক্রবর্তী। বিশ্ব মণ্ডল। অনীক ঘোষ। অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। শ্যামলেন্দু মজুমদার। রাণা রায়চৌধুরী। বিজয় সিংহ। সুস্নাত চৌধুরী। সুকুমার রুজ। সোমাভ রায়চৌধুরী। প্রবুদ্ধসুন্দর কর। সরসিজ বসু। রাণা গুপ্ত। কৌশিক মিত্র। সুবল সামন্ত। নাসের হোসেন। তারেক কাজী। নারায়ণ বৈরাগ্য। তরুণ মুখোপাধ্যায়। মুজিবর আনসারি। রাজীব ঘোষাল। মলয় ভট্টাচার্য। অভীক ভট্টাচার্য। শোভন ভট্টাচার্য। নৃসিংহমুরারি দে। দেবনাথ দে। সৌরভ মুখোপাধ্যায়। সুজিত সরকার। সৌরভ দে। দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। কবিতা ক্যাম্পাসের সকলে। ক্লেদজ কুসুমের সকলে। দেবাশিস তরফদার। প্রবীর মণ্ডল। অর্দ্ধেন্দুশেখর দেব। অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্যামলজিৎ সাহা। শ্যামলবরণ সাহা। অরুণ বসু। অরুণ সাধুখাঁ এবং অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়।

স্বদেশকথন ১লা মে, ১৯৮১

ভারতবর্ষ বিষয়ে কিছু জানাইতে ইচ্ছা করে । আমি ১৯৪৯ সালে
কলিকাতায় জন্মাইয়াছি এবং অদ্যাপি এই শহরেই ঝাঁচিয়া আছি
ইহা প্রথমেই জানাইবার । আরো জানাইবার যে আমি একজন
পুরুষ, অর্থাৎ আনন্দকে আমি জানিয়াছি পুরুষাঙ্গের অনুভূতির সহিত
যাহা আনন্দের সহিত ঋজুতা ও যাথার্থ্যের সমীকরণ
আমার মধ্যে করিয়া দিয়াছে । আমি জানিয়াছি, পুরুষ-অঙ্গের
পূর্ণ উদ্দীপনার সময় কোনো পুরুষ-আত্মা ভুল করে না - কিন্তু
উদ্দীপনাটি পূর্ণের অপেক্ষা একটু হ্রস্ব হইলেই,
আত্মারও বিকল্প তৈরী হয় । এবং পুরুষ-অঙ্গের পূর্ণ
উদ্দীপনা পরিবেশসংক্রান্ত মননির্ভর । আমি লক্ষ করিয়াছি
গঙ্গাবাতাসে, খাটিয়ায়, লণ্ঠনের আলোয় আমার চরম উদ্দীপনা
হইয়াছিল । ভারতবর্ষ বিষয়ে, আমি এ-ই জানিয়াছি ।

যৌবনবিষয়ে একটি হিন্দু অভিজ্ঞতা

বজ্রবিরোচন আকাশের নীচে আমাদের সকলের দেশবিভাগ
হইয়া যায় । পরিত্যক্ত শৈশবকালিকা হাসিতে থাকেন, ধূমওঠে ।

দেশবিভাগকে আমরা প্রাপ্তবয়স্কতা বলিয়া নির্ধারণ করি, অস্ত্র
ট্রেন জীপ ও ট্রাকের দ্রুতগতির সহিত মিলিয়া যায় ওং
তারে তু তারে তত্ত্বা স্বাহা এই উচ্চারণ, ইতস্তত
ছেঁড়া কাপড় পড়িয়া থাকে, বলি হয়, বলিমাংসই
প্রসাদী হয়, নেশা এইসময় বিহিত করার বিধি আছে ।

যঃ কৌমারহর

আমরা পরস্পরকে দেখিয়া ভালোবাসিয়াছিলাম । আজ জানি,তাহা
রূপ ও নয়নজাত ভালোবাসা । কেননা, কৈশোরের সেই প্রান্তরের ‘পর
এক সঙ্গে হাঁটিতে থাকার ভালবাসায় আমরা কেহ-ই পরস্পরের
রূপের মর্যাদা ভুলিয়া শরীরের উত্তেজনাকে বুঝিতে পারি নাই ।
পাঠককে জানাইব, আমি তখন উড্ডীয়মানা কিশোরী আর
সে এক রূপকথার কিশোর ।

সে যখন কিছুদিন বাদে আসিল তখন তাহাকে দেখিয়া আমার
ভাল লাগিল না । তাহার সর্বাঙ্গে একটা অস্থিমাংসময় চোয়াড়ে
ভাবআসিয়াছে, নবনীতকান্তি আর নাই, তাহাকে তাহারই কঠিন ও
রোমশ কবজি বলিয়া বোধ হয় । মাঠে হাঁটা আমাদের
অভ্যাস, হাঁটিতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম সে কিছুটা দ্বিধার সহিত
আমাকে স্পর্শ করিতেছে - কিছুটা চুরি করিয়া দেখিয়া নিতেছে ।
আমার খুব ঘৃণা হইল এবং আমি আনমনে জানিলাম, ইহাকে ঘৃণা
করিয়া আমার লাভ নাই - আমিই বা কতদিন সেই কিশোরী
থাকিব । আমি দেখিলাম, আমিও স্তনস্তূপে, শ্রোণীতরঙ্গে নামিয়া
আসিয়াছি, আমার হাবভাবে রক্তরঙের মাদকতা আসিতেছে,
আমিও আকাশের পরিবর্তে মাটির দিকে মুখ নামাইতেছি ।
সুতরাং প্রান্তরের শেষে পরস্পরের রূপের অমর্যাদা করিতে
আমাদের দ্বিধা হয় না, অর্থাৎ, সে-ও আমাকে নিষ্পিষ্ট করে এবং
আমিও তাহাকে তাহা করিতে দিই, পরস্পরের বর্তমানরূপ হইতে
দুজনেই অব্যাহতি চাই । একদিন সন্দেহ ছিল না, আলিঙ্গনশেষে
আমার সন্দেহ হইল, সে যাহা পাইল তাহা সে অন্য রমণীতে-ও

পাইতে পারে, যেরূপ অন্য পুরষদের নিকট আমার এই প্রাপ্য আমি পাইতে পারি । ক্রমে আমাদের মধ্যে টাকা, আদালত ও অন্যান্য লোকের কথাসকল আসিয়া পড়িল, সে কখনো বলিষ্ঠ হইল, কখনো দুর্বল হইল, আমি কখনো সুখী হইলাম কখনো অম্লে ভরিয়া গেলাম কিন্তু আমাদের কেশ আর পূর্বের মতো ঘন থাকিল না ।

একটি অর্থনৈতিক দুরাশা

মানুষের সহজ মমতা, চায় । মানুষেরই চতুর নির্মমতা, পায় । যেরকম দরিদ্র ও ধনী ।

যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিলাম সেদিন তাহার চুলের মল্লিকামাল্য কন্দর্পমল্লের মতো যুযুধান যুগ্ম বুকে পাড়িয়াছিল, বেণীর সহিত ।

অবশ্যই পরাভূত হইয়াছিলাম, দরিদ্র হইয়াছিলাম, কেননা, তাহাকে চাহিয়াছিলাম ।

একদিন তাহাকে পাইলাম, নিশ্ছিদ্র ঘনিষ্ঠতায় মল্লিকামালাও থাকিল না, আমারই বুকে তাহার উরসিজ অদৃশ্য হইল । আমার আলিঙ্গন চতুর ও নির্মম ছিল ইহাতে সন্দেহ কি ।

পাইবার পর? প্রাপ্তির পর আর কোনো প্রাপ্তি থাকে না, মনে হয়, প্রাপ্তব্যও নাই । পুনর্বার দরিদ্র হইতে চাহিলাম । যাহাতে আকাঙ্খা করিতে পারি । দেখিতেছি, ততোটা চতুর ও নির্মম হইতে পারি নাই ।

শত্রু

সংবাদে দেখিলাম, চিন তাহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জিংজিয়াং অঞ্চলটিতে 'রোজা' পালন নিষিদ্ধ করিয়াছে । (একমাস ধরিয়া কঠিন উপবাস - রোজা । মাসান্তে, মধুর ও পবিত্র ঈদ ।) 'রোজা'পালন করিয়াছেন বলিয়া ৩২ জন হাজতে অবরুদ্ধ; কিছুদিন আগে প্রশাসনের সহিত এক 'ধর্মযুদ্ধে' ৩৫ জনেরও বেশি শহিদ বলিয়া বি বি সি জানাইতেছেন । গোটা এলাকা জুড়িয়া 'রোজা' রুখিতে জুলুম চলিয়াছে । মুসলমান কর্মীদের সরকারি দপ্তরে রোজা পালনে বিরত থাকার

অঙ্গীকারপত্রে জোর করিয়া সই করানো হইতেছে । আঞ্চলিক খবরের কাগজগুলিতে ঢাকঢোল পিটাইয়া এই উপবাসের অপকারিতার কথা প্রচারিত হইতেছে । শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি তর্জন করিতেছে - ডিগ্রি ও কেরিয়ারের দিকেও ঘোর অনিশ্চয়তা নির্মিত হইতেছে । নিজেদের কমিউনিস্ট বলা প্রশাসন সর্বাধুনিক মহাপাপ করিতেছে ; রাষ্ট্রযন্ত্রের দুঃসহ স্পর্ধা আমরা অনেকবারই দেখিয়াছি... খুবই আশ্চর্য যে চিনেই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ বুদ্ধমূর্তি আছে । তবে এইরূপ কদর্য পাপ কেন?

গত বছর টিভিতে চিনের এক বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম । নিজ দেশের পাথর ও জলের কাব্যকবিতাকে তাহারা জানে - ইহা সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হইয়াছিল । যে নিজের দেশের পাথর ও জলের কবিতাকে জানে, সে ঈদের রোজার আত্মার দীপিত, ব্যাপনাশীল, পূত ও মধুর কাব্যকে - জীবনকাব্যকে ধরিতে পারিল না? হতবাক হইয়া গিয়াছি । এবং, একজন বাঙালি হিন্দু সাম্প্রদায়িক (প্রায় ৬৫ বৎসর পর্যন্ত যখন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল নামটি বহন করিতেছি, তখন অতি অবশ্যই আমি একজন বাঙালি হিন্দু সাম্প্রদায়িক) হিসাবে চিনের প্রশাসনের এই আচরণের রুদ্র প্রতিবাদ করিতেছি ও বলিতেছি, পৃথিবীর সব অমুসলমানদের ধিক্কার যেন এই কুকর্মের জন্য চিনের প্রশাসনের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হয় । মুসলমানরা যেন বোঝেন যে এই প্রসঙ্গে অমুসলমানেরা তাঁহাদের সঙ্গে, আছেন ।

বাজারের রাজনীতি

বাজারে ঢুকেই বুক করে ওঠে ধুকপুক -
খদ্দের কিছু আছে, বিক্রেতা শুধু একজন ।
এ তো বৈরাগ্যবাজার ! তবু আছে গৃহদায়,
বনে গাছ না থাকুক, নিয়ে যেতে হবে মেরে বাঘ,
নির্ভাঁজ, নিদাগ ।
কপালবশত
আমিই সবার শেষে পড়ে যাই । বিক্রেতা হেসে বললেন,
“মাংস বা মাছ
ফল বা আনাজ
আজ কিছু পাবেন না, ভাই” ।

"কিছু নেই, কিছু নেই?
"তা কি হয় ? ক'পিস ক্যাডার আছে, আর আছে
প্রচুর নেতা" -
"তবে তা-ই দিন,
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি এদিকে যে একেবারে
ভারতের থেকেও প্রাচীন ।"
সেই নিয়ে ফিরে আসতেই
মালিকা-তারান্নাম গৃহনেত্রীর
গালাগাল-নাচগান ই ধেই, ছেই, ছেই, ছেই,
তারা তোম্ তোম্ তেরে তোম্,
যাচ্ছো না কেন ওল্ড হোম?
এমনআনতে হাবে । বলেছে কে তা?"
আমি ইন্ডিয়া, তিনিচিন -
এভাবেই জমে যায় ঘরেলু ঘড়িয়ালের
তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা -
গিজিতাকিশান !

রাজনীতির বাজার

ভুস্ করিয়া এই ইন্ডিয়ায় উনপঞ্চাশের ডিসেম্বরে ভাসিয়া উঠিয়াছিলাম, ধুস্ করিয়া হয়তো শীঘ্রই ডুবিয়া যাইব । সেই জন্ম হইতে হিন্দু প্রধানমন্ত্রীর পাল্লায় পড়িয়া আছি । ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এমন একটি পদ, যাহাকে বাকি সকল অ-প্রধানমন্ত্রীরা সম্ভোগ করিয়া থাকে - অর্থাৎ এই পদকে ব্যঞ্জনই বলা যায় । হিন্দু, হিন্দু, একসময় ঈষৎ পার্শিছোঁয়া কিন্তু হিন্দুই, আবার হিন্দু, ঈষৎ, খ্রিস্টানস্পর্শলাগা কিন্তু হিন্দুই - হিন্দু প্রধানমন্ত্রিত্বই চলিতেছে । এখন এই এক দশক শিখ । শিখ রান্নার সহিত হিন্দু রান্নার বিশেষ প্রভেদ নাই । সাড়ে ছয় দশক বাঁচিয়া আছি, এখনো কি কোনো মুসলমান প্রধানমন্ত্রী পাইব না? অন্তত উপপ্রধামন্ত্রী? সেই একঘেয়ে হিন্দু ব্যঞ্জনই খাইতে হইবে? ২০১৪ তেও কোনো মুসলমান প্রধানমন্ত্র-পদপ্রার্থী দেখিতেছি না । আয়ুষ্কাল অনিশ্চিত, আমি খুব দ্রুত একজন মুসলমান প্রধানমন্ত্রীকে সম্ভোগ করিতে চাই । মুসলমান প্রধানমন্ত্রী বা উপপ্রধানমন্ত্রী এই উপমহাদেশকে অনেকটা নির্ভয় ও সুস্বাদু করিবে । এম সি চাগলার মতো বরণীয় মুসলমান কেবল আলঙ্কারিক পদ পাইয়া হারাইয়া গিয়াছেন । আবুল

কালাম আজাদকে অন্তত উপপ্রধামন্ত্রী করা কি উচিত ছিল না? এখনো, সলমন খুরশিদ কিংবা আর কোনো মুসলমানকে কি কংগেসজোট প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলিয়া ধরিতে পারিত না - যেমন ফারুক আবদুল্লাহ্? সৈফুদ্দিন চৌধুরী* না হয় ছোট পার্টি করেন বলিয়া বাদ দিলাম । ইহাও ঠিক যে সিকান্দর বখত আর বাঁচিয়া নাই, তা ভাজপা-জোট কি নাজমা হেপাতুল্লা বা মুখতার আব্বাস নাকভিকে প্রধানমন্ত্রী/উপপ্রধানমন্ত্রী পদে ভাবিতে পারিত না ? দে আর হিয়ার রাইট্ এনাফ্!

কোনো কৌতুক করিতেছি না । শের শাহ কি শায়েস্তা খাঁর সমূহ সুশাসন ভুলিয়া যাওয়ার তর্থ মূর্খের ন্যায় আত্মঘাত । একজন মুসলমান এই লোকসভা ভোটে প্রধানমন্ত্রী হইলে সকল সম্প্রদায়ের মন এদেশে একটু বসিত, এদেশের লোক এখন উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ হইয়া থাকিত না । আমিও আমার শেষজীবনে একজন মুসলমান প্রধানমন্ত্রীকে সম্ভোগ করিয়া মরিতে পারিতাম । - লেখাটি আগেই লেখা উচিত ছিল, দেরি হইয়া গিয়াছে; তবু দেখি, এই অভাজনের আবেদন যদি কাহারও কানে যায় ।

* কবিতাটির রচনাকালে সৈফুদ্দিন চৌধুরী জীবিত ছিলেন

সত্তা বললেন

বিয়োগে গুণে ভাগে   আমাকে ধরে রাখে
অচিরকালের   তিনলোক
পূর্ণপুরুষের   নয়নে তবু এর
অনির্বচনরূপ -   যোগ ।

ছেঁড়া কাপড়ের ঠাকুমা

তোমার কাছে এলেই মনে হয়
দেশে এলাম, এই তো সেই সব
তালপাতার পাখা, শ্রীখোল, সন্ধেবেলা চাঁদ,
কীর্তনের
ধুয়োর সেই পুরোনো মিল-- বঁধু.
যে-পুরোনো মিলের টানে বলতে চাই তুমি
                    নারায়ণের হৃদয়পদ্ম মধু

দীপ

কে উন্মাদ পলাশফুল... পুষ্পরাশি... কেন গন্ধহীন
যখন স্রোতাবর্ত ছিলো তখন কি স্বচ্ছতা আসেনি ।
এখন, শুধু বহন করা । ... সর্পিল ধূপ পুড়ছে, ঘুরছে...
দাঁড়িয়ে রয়েছে নম্র আমার পিতলপ্রদীপ, ধাতব ।

৯ জানুয়ারি ১৯৭০

ভ্রমর

একটি ভ্রমর কিন্তু একদিন চেয়েছিলো মধু
এমন তরুর থেকে, যে আকাশ-মূল

মাটির ভিতরে আজ স্তব্ধ সেই ভ্রমরের কাছে
শাখা থেকে উড়ে আসে রাশি রাশি ফুল

এই ফুলে পিতৃগ্রন্থি লেগে আছে, একথা বোলো না -
এই কথা হয়ে যাবে অধিক নির্ভুল